৫ম অধ্যায়ঃ ক্বুরআন বুঝার কিছু মৌলিক নীতিমালা

প্রারম্ভিক কথাঃ আল-কুরআন আল্লাহর কালাম, আল-কুরআন আমাদের জ্ঞানের উৎস, আইনের উৎস। আমাদের এ জীবনের মূল উদ্দেশ্য এক আল্লাহর ইবাদাত আর মূল লক্ষ্য চিরস্থায়ী জীবিনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার। আর আল-কুরআন হল আমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র গাইডবুক। তাই জীবনের লক্ষ্যে সফল হতে হলে আমাদেরকে অবস্থ্য আল-কুরআন পড়তে হবে, আল-কুরআন বুঝতে হবে এবং আল-কুরআনের বিধান মেনে বাস্তব জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের প্রথম ধাপ হল আল-কুরআন বুঝা। আর আল-কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝতে আপনাদেরকে সহযোগিতে আকরতেই আমাদের এ আয়োজন "**ক্বুরআন বুঝার কিছু মৌলিক নীতিমালা**"। বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়টিকে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা..

অনুচ্ছেদঃ ১. আল-কুরআন পরিচিতি
অনুচ্ছেদঃ ২. আল-ক্বুরআনের মূল্যায়ন ও মর্যাদা
অনুচ্ছেদঃ ৩. ক্বুরআনের উপর ঈমান
অনুচ্ছেদঃ ৪. ক্বুরআন মানার পদ্ধতি
অনুচ্ছেদঃ ৫. মুহকাম ও মুতাশাবিহ
অনুচ্ছেদঃ ৬. নাসিখ মানসুখ
অনুচ্ছেদঃ ৭. তাখসীস
অনুচ্ছেদঃ ৮. তাহরীফ
অনুচ্ছেদঃ ৯. আল-কুরআনের শ্রুতাঃ সেকাল ও একাল
অনুচ্ছেদঃ ১০. আল-কুরআনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিভাষা
অনুচ্ছেদঃ ১১. আল-কুরআন থেকে বিধান বের করার পদ্ধতি
অনুচ্ছেদঃ ১২. কুরআন নাযিলের লক্ষ্য
অনুচ্ছেদঃ ১৩. কুরআন বিমুখ জীবন

অনুচ্ছেদঃ ১. আল-কুরআন পরিচিতি

আল-ক্বুরআন আল্লাহর কালাম, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সা.র উপর অবতীর্ন। আল্লাহ যেমন মহান ও মহীয়ান, আল্লাহর কালামও তেমনি মহান ও মহীয়ান। আল্লাহর যেমন সমান বা সমকক্ষ নেই। আল্লাহর কালামেরও সমান বা সমকক্ষ নেই কিন্তু আজকাল অনেকেই এসব কথা বুঝে না। আমাদের উচিত..

- আল্লাহর কালাম হিসেবে আল-ক্বুরআনকে সঠিক মূল্যায়ন করা।
- আল্লাহর কালামকে যথাযত মর্যাদা দেয়া।
- আল-ক্বুরআনে বর্নিত যাবতীয় তত্ব, ইতিহাস, নীতিমালা ও বিধানসহ সবকিছু মেনে নেয়া এবং বিশ্বাস করা

এটাই আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর হুকুম মেনে চলা আমাদের উপর ফরজ। আর এজন্যই আল-ক্বুরআনকে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হয়, কিভাবে মর্যাদা দিতে হয়, কিভাবে বিশ্বাস করতে হয় এবং কিভাবে মানতে হয়? এসব জানা আবশ্যক। তাই আসুন! প্রথমে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নেই।

অনুচ্ছেদঃ ২. আল-ক্বুরআনের মূল্যায়ন ও মর্যাদা

অনেক মানুষ এমন আছে যারা মুখে মুখে কুরআন মানে, কুরআনকে বুকে লাগায়, মুখে লাগায়। কিন্তু আল-ক্বুরআনকে সঠিক মূল্যায়ন করে না, উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। বরং নানাভাবে অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন করে। আর এসের অন্যতম একটি হচ্ছে আল-কুরআনকে ধর্মগ্রন্থ বলা।

ক্বুরআন বনাম ধর্মগ্রন্থঃ পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে এবং প্রায় সবকটি ধর্মেরই ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমনঃ হিন্দু ধর্মের পুরাণ, গীতা ও মহাভারত, খৃষ্টান ধর্মের বাইবেল ইত্যাদি। তবে আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য সকল ধর্ম আর আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য সকল ধর্মগ্রন্থই মানব রচিত ও মনগড়া। বাইবেল পুরাপুরি মনগড়া না হলেও পরিবর্তিত এবং ভেজাল যুক্ত।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। আদম আ. থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সবার জন্য আল্লাহর মনোনীত জীবন আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলামী বিধান মতে আইনের মূল উৎস আল-কুরআন। আল-ক্বুরআন আল্লাহর কালাম। আল-ক্বুরআন মানব ও দানব জাতির জন্য আল্লাহর দেয়া একমাত্র সংবিধান। তাই আল-কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবেই মানতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে।

শয়তান ও তার দুসররা সর্বদাই ইসলাম বিদ্বেষী, ক্বুরআন বিরোধী। কিন্তু প্রকাশ্যে ক্বুরআনের বিরোধিতা করা কঠিন বিধায় তারা অতি কৌশলে কাজটি করে থাকে। তারা আল্লাহর কালামকে আল-কুরআন না বলে কৌশল

করে বলে ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ বলে তারা আল-কুরআনকে অন্য সকল ধর্মগ্রন্থের সমান কাতারে নামিয়ে দেয়। আর এমন করে অতি কৌশলে তারা আল্লাহর কালাম হিসেবে আল-ক্বুরআনের বিশেষত্ব ও মর্যাদাকে অস্বীকার করে।

তারা বুঝাতে চায়ঃ গীতা একটা ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ একটা ধর্মগ্রন্থ, বাইবেল একটা ধর্মগ্রন্থ, কুরআনও একটা ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে তাদের কাছে কুরআন, বাইবেল এবং গীতার মান ও মর্যাদা সমান। তাইতো তাদের সভা সমাবেশে ক্বুরআন, গীতা ও বাইবেলকে সমান মর্যাদা দিয়ে পাঠ করা হয়।
শয়তানের দুসররা এভাবে আল্লাহর কালামকে অসম্মান করেও, আল্লাহর কালামের সাথে চরম বেয়াদবী করেও তাদের অনেকেই আবার মুসলিম সাজে, ভাল মানুষের অভিনয় করে দেশ ও জাতির সর্বনাশ করে, সমাজকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে, মানুষকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিয়ে শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে।
আমাদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, মুঅমিন হতে হলে আল্লাহর কালাম হিসেবে আল-ক্বুরআনকে যথাযত মূল্যায়ন করতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে; আল-ক্বুরআন অন্যান্য গ্রন্থের মত শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়। আল-ক্বুরআনের মর্যাদা সকলের উপরে, আল-ক্বুরআনের মূল্যায়ন সবকিছুর উর্দ্ধে। আল্লাহর সাথে যেমন কোনো মাখলুকের তুলনা হয় না, আল্লাহর কালামের সাথেও অন্যকিছুর তুলনা হয় না। আল্লাহর কালামকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সমমানে নামিয়ে আনলে আল-ক্বুরআনের অবমূল্যায়ন হয়, অবমাননা হয়।
আল্লাহর কালামকে অবমূল্যায়ন করা বা অবমাননা করা কুফর। কোনো মুসলমান এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে ইবাদাত বন্দেগী সব বরবাদ ও নিস্ফল হয়ে যায়। আর এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায় আর সে মুনাফিক হয়ে মহান আল্লাহর অফুরন্ত ক্ষমা ও রহমত থেকে চির তরে বঞ্চিত হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। তাই সাবধান! বন্ধুগণ খুব সাবধান!!

মনে রাখতে হবেঃ মানব জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং চিরস্থায়ী জীবনে চির সুখময় জান্নাত হাসিল করা আর এজন্য প্রকৃত মুঅমিন হতে হবে, মুঅমিন না হয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। আর মুঅমিন হতে হলে আল্লাহ থেকে আগত যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়। ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের একটি হল কিতাবসমূহের উপর ঈমান। সুতরাং মুঅমিন হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে কিতাবের উপর ঈমানের বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩. ক্বুরআনের উপর ঈমান

ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের একটি হচ্ছে কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। ইমানদার হতে হলে আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের উপর ঈমান আনতে হবে। আল্লাহর কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা আছে সবকিছু মেনে নিয়ে তাতে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখার নাম কিতাবের উপর ঈমান। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছেন এর নাম আল-ক্বুরআন। সুতরাং আমাদেরকে মুঅমিন হতে হলে আল-কুরআনে বর্নিত তথ্য, ইতিহাস ও বিধানসহ যাবতীয় বিষয় মেনে নিতে হবে।

আল-কুরআনের আয়াতে ভিন্নতাঃ আল-ক্বুরআন অধ্যায়ন করলে দেখা যায় এর সকল আয়াত সমান নয়। কিছু আয়াত বুঝা যায় আর কিছু বুঝা যায় না। কোনো আয়াত সুস্পষ্ট আর কোনোটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাই আল-ক্বুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে বিভিন্নভাবে মানতে হবে, বিভিন্নভাবে বিশ্বাস করতে হবে। নিম্নে এর কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।
উদাহরণঃ ১. আল-ক্বুরআনে কিছু আয়াত আছে যার অর্থ আমরা জানি না। যেমনঃ কোনো কোনো সুরাহর শুরুতে **আলিফ লা-ম মীম, হা'-মীম,** ইত্যাদি বর্নমালা লিখা হয়েছে। যাকে বলা হয় "হুরুফ মুক্বাত্বায়া'ত" (বিচ্ছিন্ন বর্নমালা) এসব বর্নের অর্থ কি, এগুলো কেন ব্যবহৃত হয়েছে, এর রহস্য কি? আমরা এসবের কিছুই জানি না। তাই এসব বর্নমালা লিখার পর মুফাসসীর ইমামগণ লিখে থাকেন "এসবের ব্যাপারে আল্লাহ-ই ভালো জানেন"।
অর্থ না জানলেও এসব বর্নমালার প্রতি ঈমান আনতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে, এটাও আল্লাহর কালাম এবং এর মর্ম আল্লাহই ভালো জানেন। ঘোষণা করতে হবেঃ মর্ম যাই হোক আমি সব বিশ্বাস করি। তবেই এর উপর ঈমান আনা হবে।

উদাহরণঃ ২. আল-ক্বুরআনে এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার শাব্দিক অর্থ আমরা জানি কিন্তু মর্ম বুঝি না। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমার রাব্ব আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর **"ইস্তিওয়া" করেছেন** (অধিষ্ঠিত হয়েছেন) আরশে। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। কেউ সুফারিশ করতে পারবে না তাঁর অনুমতি ছাড়া। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। দাসত্ব/ইবাদাত করো শুধুই তাঁর। তোমরা কি মেনে নেবে না? (১০ ইউনুসঃ ৩)
এছাড়াও আরো কয়েকটি আয়াতেও বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে "ইস্তিওয়া" করেছেন। আমরা জানি ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্টিত হওয়া, আসন গ্রহণ করা। শাব্দিক অর্থ জানা থাকলেও আল্লাহ কিভাবে ইস্তিওয়া করেছেন এসব আমরা বুঝি না। কারন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে তিনি আমাদের কাছে, তিনি আমাদের সঙ্গে।
আল-ক্বুরআনে ব্যবহৃত এমন শব্দসমূহ না বুঝেই বিশ্বাস করতে হয়। এসবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যেহেতু আমাদের সাধ্যের বাইরে তাই এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়া উচিত নয়। তাইতো উক্ত শব্দের বিশ্লেষণে ইমাম মালিক রাহিঃ বলেছেনঃ "ইস্তিওয়া মা'লুম, ওয়া-ল-কাইফ মাজহুল, ওয়া-ল-ঈমানু বিহি ওয়াজিব, ওয়া-স-সুআলু আ'নহু বিদয়া'হ" অর্থাৎ ইস্তিওয়া অর্থ জানা আছে কিন্তু আল্লাহ কিভাবে ইস্তিওয়া করেছেন তা জানা নেই। তবে এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব আর এবিষয়ে প্রশ্ন করা বিদয়াত। (মাজমুয়ু'-ল-ফাতাওয়াঃ ৪/৪, কুরতুবীঃ ৭/১৪১)

সূরাহ আ'রাফের ৫৪তম আয়াতের তাফসীরে ইমাম মালিক রাহিঃর উক্তিটি উল্লেখ করে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন এটাই (রাসূল সাঃর স্ত্রী) উম্মু সালামাহ রা.র অভিমত আর এব্যাপারে এতটুকু জানাই যথেষ্ট। (তাফসীর কুরতুবীঃ ৭/১৪১)

তাই বিষয়টিকে এভাবেই মেনে নিতে হবে। এবিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বা কুতর্ক মোটেই কাম্য নয়। বর্নিত হচ্ছেঃ
আব্দুল্লাহ বিন আ'মর রাঃ বলেনঃ এক দুপুরে আমি রাসূল সা.র কাছে এলাম। দুইজন লোক তখন কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে তর্ক করছিল। তাদের আওয়াজ শুনে রাসূল সা. বেরিয়ে এলেন। তাঁর চেহারায় গুস্বা ফুটে উঠেছে। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব নিয়ে তর্ক করার কারনে আগের জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। (মুসলিম)
সুতরাং বুঝা গেল আল-ক্বুরআন বা এর কোনো আয়াত নিয়ে তর্ক/বিবাদ করা উচিত নয়।
বাস্তবে দেখা যায়; মুফাসসির ঈমামগণ কোনো আয়াতের মর্ম ভিন্নভাবে বুঝেছেন বা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এভাবে বুঝা বা ভিন্নমত পোষণ করা দুষের নয়। তবে মনে রাখতে হবে এসব শুধুই অভিমত। এসব মতামতকে অভিমত হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। এসব নিয়ে কুতর্ক করা অথবা বিভাজন বা বিবাদের হাতিয়ার বানানো মোটেই কাম্য নয়।

উদাহরণঃ ৩. আল-ক্বুরআনে মাঝে মাঝে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ একাধিক। এসব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং রাসূল সা. ও সাহাবাগণ এর যে অর্থ বুঝেছেন আমাদেরকে সে অর্থই বুঝতে হবে। যেমন..
নূহ আ.র সময়ে আযাব আসার আগে মহান আল্লাহ নূহ আ.কে কথা দিয়েছিলেনঃ **তুমি ও তোমার <u>আহল</u>কে বাঁচানো হবে।**
উল্লেখ্য "আহল" শব্দের দুই অর্থঃ পরিবার ও অনুসারী। নূহ আ. শব্দটিকে পরিবার অর্থে ব্যবহার করে ছেলেকে বাঁচানোর আবেদন করে ছিলেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ
জাহাজটি তাদের নিয়ে পাহাড়সম ঢেউয়ের মাঝে ভেসে চলল। ছেলেকে বিচ্ছিন্ন (ভাবে ডুবতে) দেখে নূহ ডেকে বললঃ বৎস! কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলে আসো। ছেলে বললঃ পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, পাহাড় পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ বললঃ এ আযাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। এমন সময় ঢেউ এসে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ছেলে ডুবে গেল। (১১ হুদঃ ৪২,৪৩)
নূহ ডেকে বললঃ হে রাব্ব! ছেলে আমার "আহল" (পরিবার, তাকে বাঁচাও) নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য, অবশ্যই তুমি সকল ক্ষমতার উৎস। আল্লাহ বললেনঃ নূহ! সে তোমার "আহল" (অনুসারী) নয়। তার কাজকর্ম সঠিক নয়। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমার কাছে এমন কিছু চেয়ো না (বল না) যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই। নতুবা তুমিও মুর্খদের দলভুক্ত হবে। নূহ বললঃ হে রাব্ব! যে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই এমন কিছু চাওয়া (বলা) থেকে তোমার কাছে সুরক্ষা চাই। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। (১১ হুদঃ ৪৫-৪৭)
সুতরাং বুঝা গেল আল-কুরআনের যত আয়াতে একাধিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এসব শব্দের ওই অর্থই মানতে হবে যা আল্লাহ ও রাসূল বুঝিয়ে থাকেন। অন্যথায় বিভ্রান্তি অবধারিত।

উদাহরনঃ ৪. আল-ক্বুরআনে কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো সহজে বুঝা যায় না, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এসব আয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে থাকলে এটাই মেনে নিতে হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! আমি (এ কিতাব দিয়ে সবাইকে এই মর্মে) সাবধান করে দিচ্ছি (যে, এটা না মানলে আযাব অবধারিত হয়ে যাবে,) আমি এটা নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, যে রাতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদি আলাদা করা হয়। (৪৪ দুখানঃ ২-৪) (*মানে এ বরকতময় রাতে লাউহ মাহফুজ থেকে দুনিয়ায় কর্মরত ফিরিস্তাদের হাতে এক বছরের গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদি হস্তান্তর করা হয়।*)

আমরা জানিঃ আল-কুরআন ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে আর উক্ত আয়াত বলছে একরাতে নাযিল হয়েছে। কথাটি আমরা দুইভাবে বুঝতে পারি। যথা..

- আল-কুরআন লাউহ মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশে নাযিল হয়েছে একরাতে।
- আল-কুরআন অবতরণ শুরু হয়েছে একরাতে।

উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা গেলঃ যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে এটা খুবই বরকতময় রাত এবং এ রাতেই অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদি ফিরিস্তাদের হাওয়ালা করা হয়। তবে কুরআন নাযিলের এ বরকতময় রাত কোনটি, উক্ত আয়াতে কথাটি নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এখানে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এ অস্পষ্টতা দূর করতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। মহান আল্লাহ সদয় হয়ে নিজেই বিশ্লেষণ করে এ অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ রামাদ্বান মাস। যাতে মানুষের হেদায়াত, সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ফুরক্বান (ভালমন্দ নির্ধারনের নীতিমালা) নিয়ে নাযিল হয়েছে ক্বুরআন। যেব্যক্তি এ মাস পাবে সে অবশ্যই রোজা রাখবে। তবে কেউ অসুস্থ্য হলে বা সফরে থাকলে (এ রোজা) অন্যদিন পূর্ন করবে। আল্লাহ তোমাদের তরে সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। (তিনি সুযোগ দিচ্ছেন) যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ন কর, আল্লাহর মহত্ব বর্ননা করো এবং শোকর করো, তিনিই তোমাদের হেদায়াত করেছেন। (বাক্বারাহঃ ১৮৫)

এ আয়াত সূরাহ দুখানের আয়াতকে একটু স্পষ্ট করেছে। এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, আল-ক্বুরআন রমজান মাসে নাযিল হয়েছে। এতে বুঝা গেল ক্বুরআন নাযিলের বরকতময় রাতটি রমজান মাসে অবস্থিত। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

আমি এটা (আল-কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতু-ল-ক্বাদরে। জানো! লাইলাতু-ল-ক্বাদর কি? লাইলাতু-ল-ক্বাদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে প্রভুর অনুমতি ক্রমে রুহ (জিবরাঈল) ও ফিরিস্তাগণ অবতীর্ন হয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদি নিয়ে। (এরাতের) প্রশান্তি ফজর পর্যন্ত (বিরাজমান) (৯৭ আল-ক্বাদর)

এ সূরায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। এখানে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে আল-ক্বুরআন লাইলাতু-ল-ক্বাদরে নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরাহ দুখানের ৪র্থ আয়াত, বাক্বারাহর ১৮৫তম আয়াত আর এ সূরাহ একত্র করলে পরিষ্কার বুঝা যায়; যে বরকতময় রাতে আল-ক্বুরআন নাযিল হয়েছে ইহা রমজান মাসে অবস্থিত লাইলাতু-ল-ক্বাদর। এবং এ রাতেই অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদি ফিরিস্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাই বিষয়টিকে এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ- উম্মতের উলামা ও ইমামগণ আয়াতটিকে এভাবেই বুঝেছেন। এবং এসব আয়াত একত্র করে বিষয়টিকে এভাবেই বুঝিয়েছেন। তাফসীরের কিতাবাদীতে এটাই উল্লেখ আছে। শুধু "তাফসীর কাবীর" নামক কিতাবে উল্লেখিত তাফসীর বর্ননা করার পর আরো একটি অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ ইকারামাহ সহ কিছু মানুষ মনে করেন এটা হচ্ছে "মধ্য শাবানের রাত/লাইলাতু-ল-বারাআত"। প্রথম মত সম্পর্কে ৫টি দলীল উল্লেখ করার পর ওখানে লিখা হয়েছে "প্রথম মতটিই সঠিক এবং ২য় অভিমতের পক্ষে কোনো দলীল নাই"। (অর্থাৎ তাফসীর কাবীরে শবে বরাতের অভিমতটি খন্ডন করা হয়েছে) (তাফসীর কবীরঃ সূরাহ দুখানের ৪র্থ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে) কিন্তু পরিপক্ষ জ্ঞানের অভাবে কিছু মানুষ বিষয়টি নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন।

আসলে আল-ক্বুরআনের আয়াতকে অন্য আয়াত বা হাদিছ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হয়। তবে বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো আয়াত বা হাদীছ না পাওয়া গেলে সাহাবী, তাবিয়ী' বা মুফাসসির ইমামগণের মতামত দেখতে হয়। এটাই তাফসীরের গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি।

উদাহরনঃ ৫. আল-ক্বুরআনের অনেক আয়াতে মানব জাতির ইতিহাস বর্নিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে আগেরকার অনেক জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে কত জনপদ। যেমনঃ

- আ'দ জাতিকে ঝঞ্জাবায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে যা সাতরাত ও আটদিন একাধারে প্রবাহিত ছিল।
- ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে ভূমিকম্প ও গর্জন দিয়ে।
- লুত আঃর জাতিকে ধ্বংস করে তাদের আবাসস্থলকে সাগরে পরিণত করা হয়েছে।
- আবরাহার হাতি বাহিনী ধ্বংস করা হয়েছে পাখি দিয়ে। এসবই ছিল আল্লাহর আযাব। ইরশাদ হচ্ছে..

ছামূদ ও আ'দ (জাতি) প্রচন্ড আঘাতকারিনী (মহাপ্রলয়)কে অবিশ্বাস করেছে। ফলে ছামূদকে ত্বাগি'ইয়াহ (ভয়াবহ গর্জন ও ভূমিকম্প) দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে হিম শীতল ঝঞ্জাবায়ু দিয়ে। যা একাধারে আটদিন ও সাতরাত প্রবাহিত ছিল। (সেখানে থাকলে) তুমি দেখতে; লোকজন বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের মত পড়ে আছে।

(৬৯ আল-হাক্কাহঃ ৪-৭)
(লুতের জাতির উপর) আযাব দিয়ে তাদের উঁচু ভূমিকে নিচু করে দিলাম, বর্ষন করলাম শিলাবৃষ্টি যা প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল। এ জনপদ (মক্কার) জালিমদের থেকে বেশী দূরে নয়। (১১ হুদঃ ৮২,৮৩, তাদের এলাকাটিই বর্তমানের মৃত সাগর) সুতরাং এসব ঘটনাবলিকে এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্যকিছু মেনে নেয়া যাবে না।

উদাহরণঃ ৬. আল-ক্বুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। এবং সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ স্বতন্ত্র জাতি। প্রথম আদিমানব আদম আ.। আল্লাহ রাব্বু-ল-আ'লামীন তাকে সৃষ্টি করে জান্নাতে থাকতে দিয়ে ছিলেন এবং আল্লাহর কথা অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল খাবার কারণে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..
তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পুরামাটির মত শক্ত মাটি দিয়ে। (৫৫ আর-রাহমানঃ ১৪)
আমি বললামঃ আদাম! তুমি স্বস্ত্রীক জান্নাতে বসবাস কর। মনে যা চায় মজা খাও। তবে ওই গাছটির কাছেও যেও না। তাতে তুমি জালিমদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটাল, তাদের অবস্থান থেকে বের করে ফেলল। আমি বললামঃ নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু। তোমাদের কিছুদিন দুনিয়ায় অবস্থান করতে হবে। তোমাদের জন্য সেখানে আছে নির্ধারিত সময়ের নিদৃষ্ট উপকরণ। (বাক্বারাহঃ ৩৫, ৩৬)
সুতরাং মানুষ মাটির তৈরি, মানুষকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, একথাই বিশ্বাস করতে হবে। কেউ অন্য তথ্য দিলে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল-ক্বুরআনের তথ্যের বিপরীতে অন্যকিছু বিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

উদাহরণঃ ৭. আল-ক্বুরআন থেকে জানা যায় মানুষ সর্বদা সতর ঢেকে রেখেছে। যখন নিষিদ্ধ ফল খাবার প্রভাবে আদম ও হাওয়্যা আ.র শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক খসে পড়েছিল তখনও তারা গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে ছিলেন। যে ধারাবাহিকতা দুনিয়াতেও অব্যাহত ছিল। সকল যুগে সকল শারীয়া'হ মতেই সতর ঢাকার বিধান ছিল এবং নবীরাসূল ও মুঅমিনগণ সতর ঢেকে রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..
শয়তান তাদের ধোঁকা দিল। বললঃ আদম! তোমাকে এমন গাছের কথা বলব? যাতে আছে অনন্ত জীবন আর অক্ষয় রাজ্য। (ওই ফল খেলেই তুমি তা হাসিল করবে। শয়তানের মিথ্যা প্রলোভনে) তারা উভয়ে ফলটি খেয়ে ফেলল। ফলে (তাদের দেহ থেকে জান্নাতী পোশাক খসে পড়ল) তাদের লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে গেল। তারা জান্নাতের বৃক্ষপাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকতে লাগল। আদম প্রভুর কথা অমান্য করল, সে ভুল করল। (২০ ত্বাহাঃ ১২০,১২১)
আল-ক্বুরআনের তথ্য মতে মানুষ শুরু থেকেই সতর ঢেকে আসছে। তাই বিষয়টিকে এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এখন যদি কেউ বলেঃ উলঙ্গ থাকাই মানুষের স্বভাব। আদি যুগ থেকেই মানুষ উলঙ্গ ছিল এবং উলঙ্গ থেকেছে। তবে ইহা মেনে নেয়া যাবে না। হয়ত কিছু মানুষ উলঙ্গ থেকেছে বা এখনো থাকছে। তবে ইহা ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মানব ইতিহাস বা মানব সভ্যতা কখনো এমন ছিল না।

উদাহরণঃ ৮. আল-ক্বুরআনে বলা হয়েছে মানব কল্যাণে নির্মিত পৃথিবীর প্রথম ঘর কা'বাহ তথা ভূপৃষ্ঠের ১ম ভূমি মাক্কাহ। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মানব কল্যাণে স্থাপিত প্রথম ঘর /প্রথম ভূমি (এটাই) যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথিকৃৎ। তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন মাক্বামু ইবরাহীম। যে এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এখানে পৌছাতে সক্ষম ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হাজ্জ করবে। (সাধ্য থাকা সত্ত্বেও) কেউ যদি না করে তবে (তার জানা উচিত) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। (৩ আল-ই'মরানঃ ৯৬, ৯৭) সুতরাং কথাটি এভাবেই মানতে হবে, এর বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নেয়া যাবে না।

উপরে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল। আসল কথা হচ্ছে আল-ক্বুরআনে বর্নিত সবকিছু বিশ্বাস করতে হবে। এর বিপরীত অন্যকিছুই বিশ্বাস করা যাবে না। আল-ক্বুরআনের বিপরীতে অন্যকিছু বিশ্বাস করলে ঈমান থাকে না। মানুষ তখন কাফির, মুরতাদ বা মুনাফিক হয়ে যায়। তখন তার ইবাদাত বন্দেগী কিছুই কবুল হয় না।

অনুচ্ছেদঃ ৪. ক্বুরআন মানার পদ্ধতি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম আল-ক্বুরআনে ঈমান রাখা, আল-কুরআনকে মর্যাদা দেওয়া ও আল-কুরআন মানার মূলকথা হচ্ছে..
আল-ক্বুরআনে বর্নিত সবকিছু বিশ্বাস করা, নৈতিক ও আদর্শিক ভাবে মেনে নেওয়া ও বাস্তব জীবনে মেনে চলা। অর্থাৎ ক্বুরআনে বর্নিত সবকিছু যেভাবে বিশ্বাস করতে হয় ঠিক তদ্রূপ আল-ক্বুরআনের সকল বিধিবিধান ও

নীতিমালা মেনে নিতে হয় ও মেনে চলতে হয়। এটাই আল-কুরআনে ঈমানের মূলকথা। আল-কুরআনে বর্নিত সামান্য কিছু বিশ্বাস না করলে বা না মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আর ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে ইবাদত বন্দেগী কিছুই কবুল হয় না। আর আল-কুরআনে উল্লেখিত সকল কিছুতে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখার এবং নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নেওয়ার পর বাস্তব জীবনে পরিপূর্নভাবে মেনে চলতে না পারলে কবিরাহ গোনাহ হয়।

বিঃ দ্রঃ- উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি..

- জান্নাতে যেতে হলে মুঅমিন হতে হবে।
- মুঅমিন হতে হলে আল-কুরআনে উল্লেখিত সবকিছু বিশ্বাস করতে হবে এবং এর বিপরিতে কোনোকিছু বিশ্বাস করা যাবে না। করলে কুফর হবে আর ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে যাবে।
- মুঅমিন হতে হলে আল-কুরআনে উল্লেখিত সবকিছু নৈতিক ও আদর্শক ভাবে মেনে নিতে হবে এবং এর বিপরিতে কোনোকিছু মানা যাবে না। করলে কুফর হবে আর ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে যাবে।
- মুঅমিন হতে হলে আল-কুরআনে উল্লেখিত সবকিছু মেনে চলতে হবে এবং এর বিপরিতে কোনোকিছু মেনে চলা যাবে না। মানলে কবিরাহ গোনাহ হবে আর ওই ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যাবে।
- কোনো কিছু মানতে হলে আগে জানতে হয়, বুঝতে হয়।
- আর আল-ক্বুরআন বুঝতে হলে নিম্ন বর্নিত বিষয় সমূহ জেনে রাখা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৫. মুহকাম ও মুতাশাবিহ

মানার ব্যাপারে আল-ক্বুরআনের আয়াত সমূহ দুই ধরনের হয়ে থাকেঃ মুহকাম ও মুতাশাবিহ। ইরশাদ হচ্ছে..
আল্লাহ নাযিল করেছেন কিতাব। এর কিছু আয়াত মুহকাম এবং এগুলোই কিতাবের মূল আর কিছু মুতাশাবিহ। যাদের অন্তর রুগ্ন তারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে ফিতনাহর জন্য বা মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য। আসলে এসবের মর্ম কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলেঃ সব আমরা মেনে নিয়েছি, সবই প্রভুর পক্ষ থেকে আগত। গ্রহণ করে তথা আল-কুরআন মেনে চলে কেবল জ্ঞানী লোকেরাই। (আল-ই'মরানঃ ৭)

মুহকাম পরিচিতিঃ বিধান সম্বলিত সুস্পষ্ট আয়াতকে মুহকাম বলা হয়। মুহকাম আয়াতসমূহই আল-ক্বুরআনের মূল। মুহকাম আয়াতসমূহ বিধান, আইন ও নীতিমালা সম্পর্কিত। এসব আয়াতের তথ্য ও বিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলা ফরজ আর অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আর নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার পর বাস্তব জীবনে মেনে না চললে কবিরাহ গোনাহ হয়।

মুতাশাবিহ পরিচিতিঃ আল-ক্বুরআনে অনেক আয়াত এমন আছে যাতে কোনো নীতিমালা বা বিধান বর্ননা করা হয়নি। একাধিক অর্থ সম্বলিত এসব আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন খুবই কঠিন। কারন মহান আল্লাহ এসবের মর্ম কাউকে বাতলে দেননি। বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী এসব আয়াতকে মুতাশাবিহ বলা হয়।

আমাদের করনীয়ঃ মুহকাম আয়াতসমূহ নীতিগত ভাবে মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে এর আইন ও বিধান মেনে চলা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। মুহকাম আয়াত অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। মুহকাম আয়াত না মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় আর কারো ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার ইবাদাত বন্দেগী কিছুই কবুল হয় না। সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।
আর মুতাশাবিহ আয়াতসমূহে যথাযত বিশ্বাস রেখে কোনো প্রকার বিশ্লেষণ না করে এভাবেই ছেড়ে দিতে হয়। এটাই আল্লাহর হুকুম, এটাই নবীর তরিকাহ। কিন্তু কিছু মানুষ এসবের তোয়াক্কা না করে মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে। মানুষ মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে দুই কারনে..

- মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য
- ফিতনাহ করার জন্য।

পরিণামঃ যারা মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে তারা পন্ডশ্রমী। তারা কোনোদিন সফল হবে না। কারন আল-ক্বুরআন আল্লাহর কালাম। এর সঠিক ব্যাখ্যা শুধু আল্লাহই জানেন। আর এসব আয়াতের ব্যাখ্যা যেহেতু আল্লাহ থেকে পাওয়া যায়নি তাই হাজারো চেষ্ঠা করেও এর সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। তবে বিভ্রান্ত ও বিক্রিত মনের লোকেরা এসব আয়াতের নানা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে লোকজনকে বিভ্রান্ত করে থাকে। আর আল্লাহর রহমত ও হেদায়ত বঞ্চিত লোকেরা এদের অনুকরণ করে বিভ্রান্ত হয়।

আসল কথা হলঃ যেসব আয়াতের সাথে মানব জীবনের কোনো আইন বা বিধান সম্পৃক্ত নয় এবং যেসব আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন সম্ভব নয়, এমন আয়াত নিয়ে যারা পান্ডিত্য জাহির করেন তাদের অন্তর রুগ্ন, তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। তাই এসব বিক্রিত মনাদের বর্জন করা একান্ত আবশ্যক। বর্নিত হচ্ছেঃ

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. একদা উক্ত আয়াত (আল-ই'মরানঃ ৭) তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ যারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে এদের বর্জন করবে। মনে করবে আল্লাহ এদের কথাই বলেছেন। (কুরতুবীঃ মুসলিম)

একটি উদাহরণঃ সাহাবাদের যামানায় কিছু মানুষ ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। খালীফাহর আনুগত্য ত্যাগ করে তারা শ্লোগান তুলে ছিল "ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুমঃ মানি না, মানবো না) তারা খালীফাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বিধায় তাদেরকে খাওয়ারিজ (বেরিয়ে যাওয়া দল) বলা হত।
তারা ইসলামী শাসন, ইসলামী সমাজ (তথা ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক) বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত ইবাদাতে মনোনিবেশ করত এবং মুসলিম নেতাদের বিভ্রান্ত ও ফিতনাহর উৎস মনে করত। তারা পবিত্র মাক্কাহে বসে ইসলামের খালীফাহ আলী, শামের আমির মুওয়াবিয়াহ ও মিশরের আমির আ'মর বিন আ'স্ব রাঃকে হত্যা পরিকল্পনা করে এবং ফজরের সময় কুফার জামে মসজিদে ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো অবস্থায় আলী রাঃকে শহীদ করে। খাওয়ারিজ নামের এ দলটি আল-ক্বুরআনের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং অনেক লোককে বিভ্রান্ত করেছে। বর্নিত হয়েছেঃ (তাবিয়ী') আবু-গালিব বলেনঃ একদা আমি (সাহাবী) আবু-উমামাহর সঙ্গে ছিলাম। আমি হেটে যাচ্ছিলাম। আবু-উমামাহ ছিলেন গাধার পিঠে। দামেস্কের জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত মানবমুন্ড দেখে আবু-উমামাহ বললেন এসব কি? বলা হলঃ খাওয়ারিজদের মুন্ড, ইরাক থেকে আনা হয়েছে। আবু-উমামাহ বললেনঃ জাহান্নামের কুত্তা, জাহান্নামের কুত্তা, জাহান্নামের কুত্তা, পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নিহত এরা। ধন্য তারা যারা এদেরকে হত্যা করেছে আর ধন্য তারা যারা এদের হাতে নিহত হয়েছে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর কাঁদতে শুরু করলেন। আমি বললামঃ আপনি কাঁদছেন! বললেনঃ এদের জন্য আফসোস হয়। এরা ইসলামের অনুসারী ছিল। কিন্তু ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ তিনি নাযিল করেছেন কিতাব। এর কিছু আয়াত মুহকাম আর এগুলোই কিতাবের মূল আর কিছু মুতাশাবিহ। যাদের অন্তর রুগ্ন তারা ফিতনার জন্য বা মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে। আসলে এসবের মর্ম কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলেঃ আমরা সব মেনে নিয়েছি, সবই প্রভুর পক্ষ থেকে আগত। গ্রহণ করে কেবল জ্ঞানী লোকেরাই। (৩ আল-ই'মরানঃ ৭ কুরতুবী)
সুতরাং আল-ক্বুরআন বুঝতে হলে এবং ক্বুরআন মেনে চলতে হলে মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাপারে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এবং যারা মুতাশাবিহ আয়াত নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করেন তাদের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬. নাসিখ মানসুখ

মুহকাম ও মুতাশাবিহ সম্পর্কে জানার পর আরো যে বিষয়টি জানা আবশ্যক তাহলঃ নাসিখ ও মানসুখ। আল-ক্বুরআনে বিধান সম্বলিত যেসব আয়াত রয়েছে এর কিছু নাসিখ আর কিছু মানসুখ। নাসিখ আয়াতে আমল করতে হয় আর মানসুখ আয়াতে আমল করতে হয় না। তাই কুরআন মেনে চলতে হলে নাসিখ মানসুখ সম্পর্কে জানা আবশ্যক।
ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। অসহায় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হয়েছিল ইসলাম। দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ন হওয়া ইসলামী বিধানে সঙ্গত কারণেই মাঝে মাঝে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াত সমূহকে বলা হয় নাসিখ ও মানসুখ।

নাসিখ পরিচিতিঃ যে আয়াত দিয়ে অন্য আয়াতের বিধান রহিত করা হয়ে একে নাসিখ বলে।
মানসুখ পরিচিতিঃ যে আয়াতের বিধান রহিত করে নতুন বিধান দেয়া হয়েছে একে মানসুখ বলে। যেমন.. সূরাহ বাকারার ১৮৪তম আয়াতের একটি বিধান হল সামর্থবান ব্যক্তিরা রামাদ্বানে রোজা রাখবে অথবা ফিদয়া দিবে। অর্থাৎ রামাদ্বানের রোজা আবশ্যক ছিল না। রোজা না রেখে ফিদয়া দিলেও হয়ে যেত। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত করে ১৮৫ তম আয়াতে বলা হয়েছে সবাইকে রোজা রাখতে হবে।

ইসলামের সূচনাতে এক বিধান রহিত করে অন্য বিধান নাযিল হলে ইয়াহুদরা তিরস্কার করে বলতঃ মুহাম্মাদ আজ এক কথা বলে, কাল অন্য কথা। আজ এটা হালাল, কাল হারাম। এটা কেমন দ্বীন? এতে নাযিল হলঃ
আমি কোনো আয়াতকে মানসুখ করলে বা ভুলিয়ে দিলে এরচেয়ে উত্তম বা সমান কিছু দিয়ে থাকি। তুমি কী জানো না? আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার মালিক। (২ বাকারাহঃ ১০৬)

আল-কুরআনে বিদ্যমান মানসুখ আয়াতসমূহঃ নিম্নে আল-কুরআনের নাসিখ ও মানসুখ আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হল..
মানসুখ আয়াতঃ ১. তোমরা যেদিকে মুখ কর সেদিকেই আল্লাহ আছেন... (২ বাকারাহঃ ১১৫)

উক্ত আয়াত যে কোনো দিকে মুখ করে নামায পড়ার অনুমতি দিচ্ছে কিন্তু পরে এ বিধানটি মানসুখ হয়ে গেছে।
এর নাসিখ হলঃ ...তোমরা যেখানেই থাকো মুখ কর মাসজিদ হারামের দিকে.. (২ বাকারাহঃ ১৪৪)
তাই এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ নামাযে মাসজিদ হারামের দিকেই মুখ করতে হবে। দিক ভুলে গেলে সঠিক দিক নির্নয়ের প্রচেষ্টা করতে হবে। যেমনঃ

- কাউকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।
- কাউকে পাওয়া না গেলে চিন্তা ভাবনা করে দিক ঠিক করে নিতে হবে।
- সম্ভব হলে কম্পাসের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

তবে সফর অবস্থায় বাহনে নফল নামায পড়লে বাহনের দিক ঠিক রেখে (কিবলাহ ঠিক না হলেও) পড়া যাবে। রাসূল সা. এমন করার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীছে উল্লেখ আছে। (তাই একে নাসিখ মানসূখ না বলে তাখসীসও বলা যায়)

মানসুখ আয়াতঃ ২. মৃত্যুকালে অসিয়ত করা সম্পদশালী ব্যক্তির উপর ফরজ করা হল.. (২ বাকারাহঃ ১৮০)
ইসলামের প্রাথমিক যুগে মৃত্যুকালে উইল করা ফরজ ছিল। পরে এ বিধানটি মানসুখ হয়ে গেছে।
এর নাসিখ হলঃ বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের অধিকার রয়েছে.. (৪ নিসাঃ ৭)
তাই এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ এখন আর অসিয়ত বা উইল এর প্রয়োজন নেই। কারনঃ উত্তরাধিকার সম্পদ বন্ঠনের বিধান যেহেতু আল্লাহ নিজেই ঠিক করে দিয়েছেন। তবে এখনো কেউ উইল করতে চাইলে দুইটি শর্ত সাপেক্ষে উইল করতে পারবে। শর্ত দুটি হলঃ

- মূল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বা এরচেয়ে কম সম্পদের উইল করতে পারবে, এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদের উইল গ্রহণযোগ্য নয়
- যে বা যারা সম্পদে অংশ পারে তাদের কারো জন্য উইল করা যাবে না। করলেও তা বাতিল হয়ে যাবে।

মানসুখ আয়াতঃ ৩. তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হল যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পুর্ববর্তিদের উপর..(বাকারাহঃ ১৮৩) অর্থাৎ বানীইসরাঈল যেভাবে রোজা রাখে তোমরাও সেভাবে রোজা রাখবে। ইয়াহুদ সমাজে রোজার রাতে ঘুমিয়ে গেলে রোজা শুরু হয়ে যেত এবং তখন থেকেই পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত। উক্ত আয়াত নাযিলের পর সাহাবাগণ এভাবেই রোজা রাখা শুরু করেন। পরে এ বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ রোজার রাতে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য হালাল করা হল.. (২ বাকারাহঃ ১৮৭)
তাই এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ রোজার রাতে ফজর শুরুর আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ।

মানসুখ আয়াতঃ ৪. ..সামর্থবান ব্যক্তি (রোজা না রাখলে) মিসকিনকে খাবার দিয়ে ফিদয়াহ আদায় করবে..(বাকারাহঃ ১৮৪)
অর্থাৎ রোজা রাখতে সক্ষম ব্যক্তি ইচ্ছা হলে রোজা রাখবে, ইচ্ছা হলে রাখবে না। তবে রোজা না রাখলে ১টি রোজার বদলে একজন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে। সূচনাতে রোজার বিধান এমনই ছিল। পরে বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ ...যে ব্যক্তি রমজান পেল সে যেন রোজা রাখে.. (২ বাকারাহঃ ১৮৫)
তাই এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তিকে রমজানের রোজা রাখতে হবে। অসুস্থতা বা সফরের কারনে রোজা না রাখলে অন্য সময়ে পূর্ন করবে। আর স্থায়ী রোগ বা বার্দ্ধক্য জনিত দুর্বলতার কারনে রোজা রাখতে সক্ষম না হলে ফিদয়াহ দিবে।

মানসুখ আয়াতঃ ৫. ..তোমরা মাসজিদ হারামের কাছে (মক্কাতে) যুদ্ধ করো না, যতক্ষন না তারা সেখানে যুদ্ধ করে.. (বাকারাহঃ ১৯১) অর্থাৎ কাফিররা আগে শুরু না করলে মক্কা নগরীতে অবস্থানরত কাফিরদের আক্রমণ করা বৈধ নয়। এটাই ছিল আল-কুরআনের বিধান। পরে এ বিধানটি মানসুখ করা হয়েছে।
এর নাসিখ হলঃ তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষন না ফিতনাহ (শিরক) নির্মুল হয় এবং সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর দ্বীন। (বাকারাহঃ ১৯৩)
সুতরাং এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ কাফির মুশরিকরা মক্কায় আশ্রয় নিলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

মানসুখ আয়াতঃ ৬. হারাম (চার) মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করবে, বলে দাও এমাসে যুদ্ধ করা মহাপাপ... (২ বাকারাহঃ ২১৭) অর্থাৎ সম্মানিত চার মাসে (যুল-ক্বা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ, মুহাররাম, রাজাব) যুদ্ধ করা বৈধ নয়। এটাই ছিল প্রতিষ্টিত বিধান। কিন্তু পরে বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।

এর নাসিখ হলঃ ..মুশরিকদের সাথে সর্বাত্বক যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সাথে সর্বাত্বক যুদ্ধ করে (তাওবাহঃ ৩৬) মুশরিকদের যেখানে (শিরক ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে) পাও সেখানেই আক্রমণ কর। (৯ তাওবাহঃ ৫)
তাই এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ প্রয়োজনে সম্মানিত মাসেও যুদ্ধ করা যাবে।

মানসুখ আয়াতঃ ৭. তোমাদের কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীদের ব্যাপারে অসিয়ত (উইল) করে যাবে, যেন তাদের ঘরে রেখে এক বছর ভরন পোষণ দেয়া হয়.. (২ বাকারাহঃ ২৪০) অর্থাৎ সূচনাতে বিধান ছিল; স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে এক বছর স্বামীর ঘরে থাকতে হত। এবং স্বামীর সম্পদ থেকে এক বছরের ভরন পোষণ দেয়া হত। কিন্তু পরে উল্লেখিত বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীগণ ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে (তথা অন্য বিয়ে থেকে বিরত থাকবে, ২ বাকারাহঃ ২৩৪)

মানসুখ আয়াতঃ ৮. ..তোমরা অন্তরের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে.. (বাকারাহঃ ২৮৪) অর্থাৎ অন্তরের পাপের কথা প্রকাশ না করলেও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু পরে বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ আল্লাহর সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপিয়ে দেন না... (২ বাকারাহঃ ২৮৬)
সুতরাং এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ অন্তরের নিয়ন্ত্রণ যেহেতু মানুষের সাধ্যের বাহিরে তাই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

মানসুখ আয়াতঃ ৯. ..আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর যথাযথ তাকওয়া.. (৩ আল-ই'মরানঃ ১০২)
আল্লাহর এ আদেশটি ছিল বড়ই কঠিন। কারন যথাযথ ভাবে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর তোমাদের সাধ্যমত.. (৬৪ তাগাবুনঃ ১৬)

মানসুখ আয়াতঃ ১০. কোনো মুসলিম নারী অশ্লীল কাজ (যিনা) করলে চারজন মুসলিমকে সাক্ষি বানাবে। তারা সাক্ষি দিলে তাকে আমৃত্যু ঘরে বন্দি করে রাখবে..(৪ নিসাঃ ১৫) এটা ছিল তখনকার দিনে যিনার সাজা। কিন্তু পরে এ বিধান মানসুখ করে নতুন বিধান দেয়া হয়।
এর নাসিখ হলঃ যিনা কারিনী নারী ও যিনা কারী পুরুষকে একশত করে বেত্রাঘাত করো। (২৪ নূর ২) সুতরাং এখন কেউ যিনা করলে কারাদন্ড দেয়া হবে না বরং (তাকে জখমী না করে সাধারন ভাবে) একশত বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেয়া হবে।

মানসুখ আয়াতঃ ১১. ..আর তোমরা যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদেরকেও অংশ দাও.. (৪ নিসাঃ ৩৩)
ইসলামের সূচনাতে পরস্পর অঙ্গিকারের মাধ্যমে পাতানো সম্পর্কের ব্যক্তিরাও উত্তরাধিকারে অংশীদার হত কিন্তু পরে উল্লেখিত বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ ..আত্মীয়স্বজনরা একে অপরের অভিভাবক.. (আনফালঃ ৭৫) তাই এখন পাতানো আত্মীয়রা উত্তরাধিকার পায় না।

মানসুখ আয়াতঃ ১২. মুঅমিনগণ! তোমরা নিশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযের কাছে যাবে না.. (৪ নিসাঃ ৪৩) অর্থাৎ তখন মদ্যপান বৈধ ছিল। শুধু নিশাগ্রস্থ অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ নিশ্চয় মদ, জুয়া, আনস্বাব (যেসব স্থাপনাকে জাতীয় ভাবে শ্রদ্ধা করা হয়। যেমনঃ মুর্তি, ভাস্কর্য, সৌধ, গাছ, পাথর, স্থান বা স্থাপনা, ইত্যাদি।) আর আযলাম (ভাগ্য তীর বা লটারী) ইত্যাদি পাপ, শয়তানের কাজ... (৫ মাইদাহঃ ৯০)
সুতরাং এব্যাপাড়ে চূড়ান্ত বিধান হলঃ মদ, জোয়া, মুর্তি, ভাস্কর্য, মিনার, সৌধ, বা অন্য কোনো স্থান অথবা স্থাপনাকে জাতীয় ভাবে সম্মান করা, ইত্যাদি হারাম ও বর্জনীয়।

মানসুখ আয়াতঃ ১৩. ..তোমরা দৃঢ়চেতা বিশজন হলে দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে.. (৮ আনফালঃ ৬৫) অর্থাৎ বিশজন মুসলিম হলে দুইশত জন কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, এটাই ছিল তখনকার দিনে যুদ্ধের বিধান। কিন্তু পরে উল্লেখিত বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ আল্লাহ এখন তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি জানেন তোমাদের অনেক মানুষ দুর্বল। তাই এখন তোমরা দৃঢ়চেতা একশত হলে দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে... (৮ আনফালঃ ৬৬)

এখন এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ একশত জন মুসলিম হলে দুইশত কাফিরের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ অবস্থায় লড়াই থেকে পালানো বৈধ হবে না। তবে এর কম হলে ভিন্ন কথা।

মানসুখ আয়াতঃ ১৪. রাসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে আগে ফী দিতে হবে.. (৫৮ মুজাদালাহঃ ১২) এক সময়ে রাসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে ফী আদায় করতে হত। কিন্তু পরে এ বিধান মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ কথা বলার আগে ফী আদায় করা কি তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে? আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। তাই ফী আদায়ে সক্ষম না হলে তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ জানেন তোমরা কি কর।(৫৮ মুজাদালাহঃ ১৩) এ আয়াত দ্বারা ফী আদায়ের বিধান রহিত করা হয়েছে।

মানসুখ আয়াতঃ ১৫. হে কম্বল ওয়ালা! রাতে উঠো (ইবাদাত কর) তবে সামান্য (ঘুমুতে পারবে) অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কম (ঘুমাবে আর বাকি রাত ইবাদাত করবে। ৭৩ মুযযাম্মিলঃ ১-৩) অর্থাৎ অর্ধেক রাত বা এর চেয়ে অধিক সময় ইবাদাত করতে নবী সাঃকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে এ বিধানটি মানসুখ হয়ে যায়।
এর নাসিখ হলঃ মুযযাম্মিলের ২০তম আয়াত। যাতে এ আদেশ রহিত করা হয়েছে।

মানসুখ আয়াতঃ ১৭. বাকারাহঃ ১০৯, নিসাঃ ৬৩, ৮১, ৯০, ৯১, ৯২, মাইদাহঃ ২, আনয়ামঃ ১০৬, হিজরঃ ৮৫, নাহলঃ ১২৫, হা-মীম সিজদাহঃ ৩০, যুমারঃ ৪১, যুখরুফঃ ৮৯, জাছিয়াহঃ ১৪, ক্বাফঃ ৪৫, যারিয়াতঃ ৫৪, নাজমঃ ২৯, মুযযাম্মিলঃ ১০।
উল্লেখিত আয়াতসহ যুদ্ধের বিরপিতে ধর্য, অপেক্ষা, ক্ষমা, উপেক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আদেশ দিয়ে যত আয়াত নাযিল হয়ে ছিল এ সকল আয়াতের বিধান মানসুখ হয়ে গেছে।
এর নাসিখ হলঃ সূরাহ তাওবাহর ৫ম আয়াত, যেখানে বলা হয়েছেঃ মুশরিকদের যেখানে (শিরক ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে) পাও সেখানেই যুদ্ধ কর। (৯ তাওবাহঃ ৫)
সুতরাং এব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান হলঃ যেখানে যুদ্ধ প্রয়োজন সেখানে যুদ্ধই করতে হবে। সাধ্য থাকা সত্বেও শুধু মার খাওয়া আর যুদ্ধ বাদ দিয়ে শুধু ধর্য, অপেক্ষা আর উপেক্ষা কাম্য নয়।

অনুচ্ছেদঃ ৭ তাখসীস

আল-ক্বুরআনের বিধান সঠিক ভাবে বুঝতে হলে "নাসিখ মানসুখ" এর মত তাখসীস সম্পর্কে ও ধারনা থাকতে হবে। তাখসীস অর্থ নিদিষ্ট করা, বিশেষিত করা। আল-ক্বুরআনে উল্লেখিত কোনো বিধানের ব্যাপকতাকে কমিয়ে সীমিত বা বিশেষিত করাকে তাখসীস বলে। ক্বুরআনের আয়াতকে অন্য আয়াত বা হাদীছ দ্বারা তাখসীস করা যায়। যেমনঃ ক্বুরআনে উল্লেখিত একটি বিধান হলঃ
তাখসীসঃ ১. মুসলিম পুরুষের জন্য মুশরিক নারী বিয়ে করা হারাম। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যতক্ষন না ঈমান আনে। মুশরিক নারী (তার সুন্দর্য ও মাধুর্য দিয়ে) তোমাদের বিমোহিত করে ফেললেও মুঅমিন দাসী তার চেয়ে অনেক ভালো.. (২ বাক্বারাহঃ ২২১)

উক্ত আয়াতকে ব্যাপক অর্থে নিলে বুঝা যায় যেসব নারী শিরক করে তাদের বিয়ে করা হারাম, চাই সে মুর্তি পূজারী হউক বা আহলে কিতাব। কিন্তু অন্য আয়াতে মুসলিম পুরুষের জন্য আহলে কিতাব নারীকে বিয়ের অনুমতি দিয়ে এই আয়াতের ব্যাপকতাকে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
(তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে)...সতী সাধবী মুসলিম নারী এবং আগেকার আহলে কিতাবের সতী নারী, যখন মোহর পরিশোধ করে স্ত্রী হিসেবে তাদের গ্রহণ করবে, রক্ষিতা বা গোপন বন্ধু (গার্ল ফ্রেন্ড) হিসেবে নয়। (৫ মাইদাহঃ ৫)

এ আয়াত দ্বারা বাক্বারার ২২১তম আয়াতে বর্নিত বিধানের ব্যাপকতাকে তাখসীস (সীমিত) করা হয়েছে। (তাফসীর ইবন কাসীর, জালালাইন। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)
এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে মুসলিম পুরুষের জন্য আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) মেয়েদের বিয়ে করা বৈধ। (তবে সময়ে সময়ে কিছু মনিষীগণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিয়ে না করার বা মুসলিম মেয়েদের প্রাধান্য দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।)

তাখসীসঃ ২. আল-ক্বুরআনে উল্লেখিত আরো একটি বিধান হলঃ মৃত খাওয়া হারাম। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত, রক্ত ... (৫ মাইদাহঃ ৩) উক্ত আয়াতে হারাম খাদ্যের বর্ননা দিয়ে বলা হয়েছে মৃত হারাম। এখানে মৃত শব্দটি ব্যাপক অর্থে নিলে সকল প্রকার মৃতই হারাম হয়ে যায়। কিন্তু এক হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

ইবন উ'মার রা. থেকে বর্নিত, রাসুল সা. বলেছেনঃ দুইটি মৃত আর দুই প্রকার রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (মৃত দুটি হচ্ছে) মাছ আর জারাদ (পঙ্গপাল, ঘাস ফড়িং) আর (হালাল দুই প্রকার রক্ত হচ্ছে) কলিজা আর প্লীহা। (ইবন মাজাঃ কিতাব আতই'মাহ, আহমদ, শাফী, দার ক্বুতনী, ইবন আ'দী।)

উক্ত হাদীছ দ্বারা ক্বুরআনে উল্লেখিত মৃত শব্দটির ব্যাপকতাকে তাখসীস (সীমিত) করা হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয় অন্য সকল মৃত হারাম হলেও মাছ আর জারাদ মরে গেলেও হালাল থাকে। উক্ত হাদীছের এক দুইজন রাওয়ীকে কেউ কেউ দ্বাই'ফ বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন গ্রহণ যোগ্য। তবে শাইখ আলবানী বলেছেনঃ হাদীছটি জায়্যিদ (গ্রহণ যোগ্য)

তাখসীসঃ ৩. আল-ক্বুরআনে উল্লেখিত আরো একটি বিধান হলঃ রক্ত খাওয়া বা পান করা হারাম। ইরশাদ হচ্ছেঃ

> তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত, রক্ত... (৫ মাইদাহঃ ৩) উক্ত আয়াতে রক্তকে হারাম করা হয়েছে। শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে নিলে সকল প্রকার রক্তই হারাম হয়ে যায়। কিন্তু অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে..
>
> বলে দাও, আমার কাছে আগত ওহীর বিধানে আমি হারাম পেয়েছি শুধু মৃত, **প্রবাহমান রক্ত** এবং শূকরের মাংস, কারন ইহা অপবিত্র ... (৬ আনয়া'মঃ ১৪৫)

মাইদাহর ৫ম আয়াতে রক্ত শব্দটি ব্যাপক ভাবে উল্লেখ হলেও আনয়া'মের ১৪৫ তম আয়াতে এটাকে তাখসীস (বিশেষিত) করে বলা হয়েছে "প্রবাহমান রক্ত"। এতে বুঝা যায় গুস্তের সাথে লেগে থাকা রক্ত হারাম নয়। তাই গুস্ত না ধোয়ে পাক করলেও হারাম হবে না।

অনুচ্ছেদঃ ৮. তাহরীফ

আল-কুরআন বুঝতে হলে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হলে মুহকাম, মুতাশাবিহ, নাসিখ, মানসুখ ইত্যাদি বিষয় সমূহের উপর যেমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে ঠিক তেমনি তাহরীফ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখতে হবে। ইয়াহুদরা প্রথম তাহরীফ শুরু করেছিল।

তাহরীফ পরিচিতিঃ তাহরীফ অর্থ পরিবর্তন। আল-কুরআনের শব্দ, অর্থ, মর্ম বা বিধান বদলে ফেলাকে তাহরীফ বলে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

> তোমরা কি মনে কর তারা (ইয়াহুদ) তোমাদের মত ঈমান আনবে? অথচ তারা আল্লাহর কালাম শুনে, বুঝে এবং জেনে বুঝে তাহরীফ করে। (বাকারাহঃ ৭৫) মানে যারা আল্লাহর কালামে তাহরীফ করে তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না। ইয়াহুদরা আল্লাহর কালামের শব্দকে **তাহরীফ** করত এবং বলতঃ শুনলাম তবে মানলাম না। (তাদের আলিমরা) বলত (মুহাম্মদের কথা) এমনভাবে শুনবে যেন শোনই নাই। মুখ ব্যাংচিয়ে তিরস্কার করার জন্য (নবীকে) বলতঃ রাই'না। (এমন না করে) তারা যদি বলতঃ শুনলাম আর মেনে নিলাম। (আলিমরা যদি বলত মানার জন্য) শোন, (আর নবীকে বলতঃ) লক্ষ্য করুন। তবে কতই ভালো ও কল্যাণকর হত। কিন্তু এতসব কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। ঈমান তারা কমই আনবে। (৪ নিসাঃ ৪৬)

উল্লেখ্য "রায়ি'না" অর্থ আমাদের রাখাল। আরবী সমাজে শব্দটি আমাদের নেতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর ইয়াহুদ সমাজে "রায়ি'না" একটি গালি। ইয়াহুদরা রাসূল সাঃকে "রায়ি'না" বলে সম্বোধন করত। এর দ্বারা বাহ্যত তারা বুঝাত "আমাদের নেতা"। আর মনে মনে গালি অর্থে ব্যবহার করে আনন্দ পেত এবং ইশারা ইঙ্গিতে হাসাহাসি করত। উক্ত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাহরীফ আবার কয়েক ভাবে হয়ে থাকে। যথা..

১. শব্দগত তাহরীফঃ মানে শব্দকে বদলে ফেলা। যেমনঃ কাফিররা বাইতুল মাকদিস (জেরু-সালেম/জেরুজালেম) দখল করে ইয়াহুদদের সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল। শহর পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করা আল্লাহ তাদের উপর ফরজ করে ছিলেন। আল্লাহর হুকুম পালনে ইয়াহু যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। শত্রুর অবস্থা জানার জন্য তারা ১২জন নেতাকে পাঠাল। এ ১২জনের ১০জনই শত্রুর শক্তি দেখে ঘাবড়ে গেল এবং জনতাকে ভয় দেখাল। ভীত ইয়াহুদ যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল। তারা বললঃ মূসা! তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বললঃ মুসা! যতক্ষণ এরা থাকবে আমরা সেখানে যাব না। তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকলাম। (৫ মাইদাহঃ ২৪)

এমন বলার কারনে আল্লাহ তাদের সাজা দিলেন। ৪০বছর তারা তীহ উপত্যকা থেকে বের হতে পারল না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুসা বললঃ হে রাব্ব! আমি কেবল আমার আর আমার ভাইয়ের জিম্মাদার। (যুদ্ধ বিমুখ জাতির জিম্মাদার আমি নই।) পাপিষ্ঠদের থেকে আমাদেরকে আলাদা করে দাও। আল্লাহ বললেনঃ আমি তাদের তরে চল্লিশ বছর (এখান থেকে বের হওয়া) হারাম করে দিলাম। তারা এখানেই ঘুরপাক খাবে। পাপিষ্ঠদের জন্য আফসোস করো না। (৫ মাইদাহঃ ২৫,২৬)

তারা চল্লিশ বছর এখানে ঘুরপাক খেল। এ ৪০ বছর খাদ্য হিসেবে তাদের দেওয়া হল মান্না ও সালওয়া। দেয়া হল মেঘের ছায়া এবং পাথর থেকে নির্গত স্বচ্ছ পানি। তারা মান্না সালওয়ার উপর আপত্তি করে মাটি থেকে উৎপাদিত খাবার চাইল। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তোমরা যখন বললেঃ মুসা! এক-ই খাবার আর ধর্যে কুলাচ্ছে না। প্রভুকে বলঃ শাকসবজি, শসা, ফুম (গম, ছানা) ডাল, পিয়াজ তথা মাটি থেকে উৎপাদিত খাবার দিতে। মূসা বললঃ তোমরা উৎকৃষ্ট (খাবার) বদলিয়ে সাধারন (খাবার) চাচ্ছ? (আল্লাহর আদেশ মেনে) শহরে প্রবেশ কর। তোমরা যা চাও সব সেখানে বিদ্যমান আছে। (বাক্বারাহঃ ৬১)

ইয়াহুদ শহরে যেতে রাজি হল। আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হলেন। শহরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তবে বলে দিলেনঃ যেন ক্ষমা চেয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ করে। ক্ষমার জন্য শব্দ শিখিয়ে দিলেন "হিত্তাহ"। বলা হলঃ মাথা নিচু করে "হিত্তাহ" বলতে বলতে প্রবেশ করবে। তারা যে পথে শহরে প্রবেশ করেছিল তা এখনো "বাব হিত্তা" (হিত্তা গেইট) নামে খ্যাত। কিন্তু পাপিষ্ঠরা শব্দটি বদলে ফেলল। তারা পিছিয়ে পিছিয়ে প্রবেশ করল এবং "হিত্তাহ" (ক্ষমা চাই) এর বদলে বলল "হিন্তাহ" (গম চাই, আটা চাই) ইরশাদ হচ্ছেঃ
যখন বললাম শহরে প্রবেশ কর, মনে যা চায় মজা করে খাও তবে প্রবেশ করবে অবনত শিরে "হিত্তাহ" (ক্ষমা চাই) বলে বলে। (তাহলে) তোমাদেরকে মাফ করে দেব। সৎলোকদের আরো অনেক (পুরস্কার) দেব। কিন্তু পাপিষ্ঠরা শব্দটি বদলে ফেলল। ফলে তাদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করলাম। কারন তারা পাপিষ্ট। (২ বাকারাহঃ ৫৮,৫৯)

এই হল শব্দগত তাহরীফ। ইয়াহুদ "হিত্তাহ" শব্দকে বদলে **"হিন্তাহ"** বলেছিল। এছাড়াও তারা আরো অনেক তাহরীফ করেছে। তবে আল-ক্বুরআনে শব্দগত তাহরীফ ঘটবে না। কারন মহান আল্লাহ নিজে আল-ক্বুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

২. অর্থে তাহরীফঃ আরো এক প্রকার তাহরীফ হচ্ছে শব্দের অর্থ বদলে ফেলা। যেমনঃ জিহাদ শব্দ, শব্দটির এক অর্থ চেষ্টা করা। আল-কুরআনের কয়েক জাগায় শব্দটি চেষ্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বীনের জন্য যে চেষ্টা করা হয় এর চূড়ান্ত পর্যায় যুদ্ধ। তাই আল-ক্বুরআনের বহু আয়াতে শব্দটি যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আজকাল কিছু মানুষ গা-বাঁচানোর জন্য সব আয়াতেই শব্দটিকে চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে আরো অনেক শব্দের অর্থে তাহরীফ করা হয়। এমন তাহরীফ ইয়াহুদরাও করত, বর্তমানেও করা হচ্ছে।

৩. মর্মে বা লক্ষ্যে তাহরীফঃ আরেক প্রকার তাহরীফ হচ্ছে মর্ম বা লক্ষ্য বদলে ফেলা। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছেঃ
আল্লাহ মুঅমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। (আল্লাহ যাদের কিনেছেন) তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, মারবে এবং মরবে.. (৯ তাওবাহঃ ১১১) উল্লেখিত আয়াত থেকে দুইটি বিষয় বুঝা যায়।

- আল্লাহ মুঅমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।
- আল্লাহ যাদের কিনেছেন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, মারবে এবং মরবে।

অর্থাৎ আল্লাহ যাদের কিনেছেন তাদের কাজ হল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা এবং শহীদ হয়ে যাওয়া। এর মানে আল্লাহ শুধু শহীদদের কাছেই জান্নাত বিক্রি করেছেন। শহীদরা খরিদা সূত্রে জান্নাতের মালিক। তাই তারা সরাসরি জান্নাতে চলে যায়।
কিন্তু আজকাল অনেকেই এ আয়াতের মর্ম ও লক্ষ্য বদলে ফেলেন। আয়াতের প্রথম অংশ (আল্লাহ মুঅমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে) তারা ঠিক মতই বলে, তারপর ২য় অংশ নিজের ইচ্ছামত সংযুক্ত করে ফেলে। যেমন প্রথম অংশ বলার পর..
কেউ বলেঃ ভাই ও বন্ধুরা! আল্লাহ আমাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন। সব এখন আল্লাহর। তাই পকেট উজাড় করে চাঁদা দাও।
কেউ বলেঃ আল্লাহ আমাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন। তাই আসুন কিছু সময় আল্লাহর পথে ব্যয় করি। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ তারা এ আয়াতের ১ম অংশ ঠিক রেখে ২য় অংশ বদলে ফেলে। যার ফলে আয়াতের লক্ষ্য উদ্দেশ্যই বদলে যায়।

এভাবে আরো অনেক আয়াতের মর্ম ও লক্ষ্য পরিবর্তন করে তাহরীফ করা হয়। আজকাল এধরনের তাহরীফই বেশি হয়ে থাকে। তাই আমাদেরকে এব্যাপারে সাবধান হতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি নিজ দয়ায় আমাদেরকে হেফাজত কর।

আল-ক্বুরআন বুঝার জন্য আরো একটি সহায়ক বিষয় হল আল-ক্বুরআন শুনার পর মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা। রাসূল সাঃর সময়ে যারা আল-কুরআন শুনেছিল ওদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল। আর বর্তমানে যারা শুনছে এদের প্রতিক্রিয়া কি? আর ওদের সাথে এদের মিল কতটুকু। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই আসুন! এবার কুরআন শোনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নেই।

অনুচ্ছেদঃ ৯. আল-ক্বুরআনের শ্রুতা সেকাল ও একাল

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা.। মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত। সত্যিই তিনি প্রশংসিত। তিনি প্রশংসিত মহান আল্লাহর কাছে, প্রশংসিত ফিরিস্তাকুল, নবীরাসূল ও মুঅমিনদের কাছে। কাফিরদের কাছেও তিনি প্রশংসিত ছিলেন। আরবের সবাই তাঁর চরিত্র ও সততার প্রশংসা করত, তাঁর গুনে মুগ্ধ হয়ে আল-আমীন বলে ডাকতো। সবাই তাঁকে আপন মনে করত। কিন্তু ইসলাম প্রচার শুরু করতেই অবস্থা পাল্টে গেল। সবাই তখন দুশমন বনে গেল। নবীর স্বভাব চরিত্র তখনো তাদের ভালো লাগত। তাদের দুশমনির মূল কারন ছিল আল্লাহর কিতাব। ইরশাদ হচ্ছেঃ
আমি জানি তাদের কথা তোমাকে পিড়া দেয়। তারা আসলে তোমাকে অবজ্ঞা করে না। পাপিষ্ঠরা আসলে আল্লাহর আয়াত (কিতাব ও বিধান)কে অবজ্ঞা করে। (৬ আনয়া'মঃ ৩৩)

মক্কার কাফিরদের মত সর্বকালেই বেইমানদের আসল দুশমনি আল্লাহর কিতাবের সাথে। কিন্তু সরাসরি আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা করা সহজ নয়। এতে জনতা বিগড়ে যেতে পারে। ধুর্ত নেতারা তাই অন্য পথ ধরে। তারা সরাসরি ক্বুরআনের বিরোধিতা না করে ক্বুরআনের প্রচারকদের বিরোধিতা করে। তাদের নামে প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচারে মেতে উঠে। সর্বকালে সর্বযুগে এটাই তাদের চিরাচরিত নিয়ম।
আর এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় বিরোধিতা। কাল যিনি ছিলেন সবার প্রিয়, সবাই যাকে আল-আমীন বলে ডাকত। ক্বুরআনের কথা বলতেই তিনি হয়ে গেলেন সকলের দুশমন। হয়ে গেলেন বদ, খারাপ, বিচ্ছিন্নতাবাদী। শুরু হল প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচার। এমনকি তাঁর মুহাম্মাদ নামটি পর্যন্ত তাদের সহ্য হল না। নামটিকেও তারা বিগড়ে ফেলল। মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) এর বদলে মুযাম্মাম (ধিকৃত) বলে ডাকতে শুরু করল। যে ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। আজও ইসলামের কারণে ভাল মানুষকে ব্যাঙ্গ করা হয়। হাজারো মন্দ নামে বিশেষিত করা হয়।

রাসূল সা.র প্রতি ক্বুরআন নাযিল শুরু হল। তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। আল-ক্বুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করলেন। মানুষকে শুনাতে লাগলেন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালাম শুনে সেদিন অনেকে অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। কেউ আল্লাহর কালামকে জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেকে ধন্য করেছে। কেউ ধরেছে অন্য পথ। তখনকার দিনে ক্বুরআনের শ্রুতাদের থেকে মোট ৭ ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ

প্রতিক্রিয়াঃ ১. আল-ক্বুরআনের কণ্ঠকে স্তব্দ করে দেয়াঃ ক্বুরআনের বাণী সহ্য করতে না পারা এবং আল-ক্বুরআনের কণ্ঠকে স্তব্দ করে দিতে চেষ্টা করা। যেমনঃ মুহাম্মাদ সবেমাত্র নবী হয়েছেন। নবী হবার পর প্রথম কয়েকদিন কেটেছে ইবাদাতে মশগুল থেকে। এবার দাওয়াতী কার্যক্রম শুরুর তাগিদ এলো। নাযিল হলঃ
তোমার নিকট আত্মীয়দের (আল্লাহ্র বিধান না মানার পরিণতি সম্পর্কে) সাবধান করে দাও। (২৬ শুয়া'রাঃ ২১৪)

নবী সা. আল্লাহর আদেশ পেয়ে স্বাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেনঃ **ইয়া স্বাবাহা**'-। তখনকার দিনে বিশেষ কারণে লোক জমা করতে এমন করে ডাকা হত।
হঠাৎ এমন ঘোষণা শুনে মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা জানতে চাইল কে এই আহ্বানকারী। মুহাম্মাদ সাঃর কথা শুনে লোকজন জড় হল। নবী সাঃ আব্দুল মুত্তালিব পরিবার, আব্দু মানাফ পরিবার সহ ক্বুরাইশ পরিবারদের নাম ধরে ধরে সম্বোধন করলেন। তারপর বললেনঃ আমি যদি বলি শত্রু পাহাড়ের পিছনে, তারা অচিরেই তোমাদের উপর চড়াও হবে। তবে কি তোমরা বিশ্বাস করবে? সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব এল অবশ্যই। তুমি কোনোদিন মিথ্যা বলনি। নবী সাঃ বললেনঃ আমি এরচেয়ে কঠিন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। আল্লাহর বিধান মেনে নাও। নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাসূলের চাচা আবু-লাহাব মক্কার প্রভাবশালী ধনবান নেতা। আবু-লাহাব তথায় উপস্থিত ছিল। দুইহাত উত্তোলন করে বলে উঠলঃ তুমি ধ্বংস হও, মুহাম্মাদ! তুমি ধ্বংস হও। এজন্য আমাদের ডেকে এনেছো? আবু-লাহাব চলে গেল। অন্যরাও তার অনুকরণ করল।
সেদিন থেকে সব বদলে গেল। যারা মনেপ্রাণে ভালবাসত তারা ঘৃণা করতে লাগল। শুরু হল মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা। মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) নামকে ব্যাঙ্গ করে মুযাম্মাম (ধিকৃত) বলা শুরু হল। ধর্মত্যাগী, ধর্ম বিকৃতকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, জাতির দুশমন, সমাজ বিরোধী ইত্যাদি কত মন্দ নামে ডাকা শুরু হল। আর এসব ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা ছিল আবু-লাহাব ও তার স্ত্রীর।

আবু-লাহাবের স্ত্রী আ'ওরাহ, যাকে উম্মু জামীলাহ নামে ডাকা হত। আ'ওরাহ ছিল জিদ্দী ও বদমিজাজী। রাসূল সাঃ ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ সহ ইসলাম বিরোধী সকল অপকর্মে সে আবু-লাহাবকে সাহায্য করত। তাদের সম্পর্কে নাযিল হলঃ
আবু-লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে সে নিজেও। তার ধনসম্পদ সহ সকল অর্জন বেকার হয়ে যাবে। সে নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত আগুনে। সাথে তার ইন্ধনদাতা স্ত্রীও। তার গলায় মাসাদের দড়ি (জাহান্নামের দড়ি পরিয়ে দেয়া হবে) (১১১ সূরাহ লাহাব)
সূরাহটি নাযিল হবার পর রাসূল সা. সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আওরাহর কাছেও খবর পৌছে গেল। সূরাহটি শুনতে কবিতার মত মনে হল। আ'ওরাহ মনে করল তার ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে মুহাম্মাদ তাদের নিন্দাবাদ করেছে। তাই সেও মুহাম্মাদ সাঃর বিরুদ্ধে একটি ছড়া রচনা করে আওড়াতে শুরু করল।
ছড়া আওড়াতে আওড়াতে আ'ওরাহ ক্ষেপে উঠল। সে জানতে পারল আবু-বাকরকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদ কা'বাহর পাশে বসে আছে। চাক্কি ঘুরানো পুথা হাতে তেড়ে এলো আ'ওরাহ। সে চিৎকার করে বলছিলঃ মুহাম্মাদ আমার বিরদ্ধে কবিতা বানায়। সে কি জানে না, আমিও কবি। আ'ওরাহ উচ্চস্বরে আবৃত্ত করছিলঃ
"মুযাম্মামুন আ'স্বাই না, আমরুহু আবাই না, ওয়া দ্বীনুহু ক্বালাই না"। মানে...

ধিকৃত তুই, তোকে নেব নাকো মেনে, তোর আনিত সব করি বর্জন,
মুযাম্মাম! তব দ্বীন আনিত বিধান, প্রত্যাখ্যান করি তোর যত অর্জন।

মহান আল্লাহ তদীয় রাসূলের প্রতি সদয় হলেন। তিনি আ'ওরাহর চুখে অন্ধত্ব ঢেলে দিলেন। আ'ওরাহ আবু-বকরকে দেখল কিন্তু পাশে বসে থাকা মুহাম্মাদকে দেখতে পেল না। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তুমি তখন ক্বুরআন পড়ছিলে। আমি আখেরাতে অবিশ্বাসী ও তোমার মাঝে পর্দা ফেলে দিলাম। (১৭ ইসরাঃ ৪৫)

নবীকে না পেয়ে আ'ওরাহ আবু-বাকরকে শাসিয়ে গেল। বললঃ আবু-বাকর! তোমার বন্ধু আমার নিন্দা করেছে। পাইলে এই পুথা তার মুখে মারতাম। (তাফসীর ক্বুরতুবীঃ ১০/১৬০)
পর্যালোচনাঃ এই ছিল আ'ওরাহ, আবু-লাহাবের স্ত্রী। আল-ক্বুরআন তার ও তার স্বামীর নিন্দা করেছে, তাদের মানমর্যাদায় আঘাত করেছে। তাই ক্বুরআনের কন্ঠকে স্তব্দ করে দিতে পুথা হাতে তেড়ে এসেছিল আ'ওরাহ। এই হল সেকালের অবস্থা।
আর বর্তমানেও তাই হয়। আল-ক্বুরআনের যেসব আয়াতে তাগুত্বের ভিত কেপে উঠে, যেসব আয়াত বেইমান নেতাদের স্বার্থে সরাসরি আঘাত হানে, এসব আয়াত বর্ননা করলে এখনো তেড়ে আসে আ'ওরাহর উত্তরসূরিরা। আর তাদের রুষানলে পড়ে ক্বুরআনের প্রচারকদের জেল জুলুম সহ্য করতে হয়। সময়ে জীবন দিতে হয়।

প্রতিক্রিয়াঃ ২. ক্বুরআন পাঠে নিষেধাজ্ঞাঃ আবু-ক্বুহাফাহর ছেলে আবু-বাকর। নীতিবান আদর্শবান আবু-বাকর। নম্র ভদ্র বিনয়ী, জনদরদী ও গরীব দুখীর বন্ধু আবু-বাকর। অসহায় মানুষ তার কাছে আশ্রয় পায়, সাহায্য পায়, বিচার পায়। তাই সৎ নিষ্ঠাবান এ তরুন নেতার প্রশংসা সবার মুখে মুখে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে অত্যাচারিত হতে হল আবু-বাকরকেও। অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হলেন তিনি। ইতিমধ্যেই নির্যাতিত মুসলিমরা আফ্রিকায় আশ্রয় নিয়েছেন। এক বিকালে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে মক্কাহ ত্যাগ করলেন আবু-বাকর।

পথে কারাহ গোত্রের নেতা ইবনু দিগা'নাহর সাথে দেখা। আবু-বাকর দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শুনে ইবনু দিগা'নাহ হতভম্ব হয়ে গেল। ভাবলঃ এমন নীতিবান নেতার দেশ ত্যাগ জাতির জন্য শুভ হবে না। তাই ফিরে আসার অনুরোধ করল এবং স্বাধীন ভাবে আল্লাহর ইবাদাতের সুযোগ করে দেবার নিশ্চয়তা দিল। আবু-বাকর রা. ইবনু দিগা'নাহর কথায় ফিরে এলেন। ইবনু দিগা'নাহ সবাইকে জানিয়ে দিলঃ এখন থেকে আবু-বাকর আমার আশ্রয়ে। কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।

ইবনু দিগা'নাহ আরবের প্রভাবশালী নেতা। তার কথা সবাই মেনে নিল। তবে বেইমানরা ইবনু দিগা'নাহকে বললঃ আবু-বাকর ব্যক্তিগতভাবে যা খুশী করুক, আমাদের আপত্তি নাই। শুধু বলে দাওঃ সমাজে যেন বিচ্ছিন্নতাবাদ না ছড়ায়। ইবনু দিগা'নাহ বললঃ আবু-বাকর, ঘরের ভিতর যা খুশী কর, বাইরে ঝামেলা করতে যেও না।

কিছুদিন এভাবেই কেটে গেল। আল্লাহর দ্বীন পালনে এত বাধ্যবাধকতা আবু-বাকরের সহ্য হল না। তিনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ শুরু করলেন। ফুসে উঠল বেইমানরা। তারা ভাবলঃ এভাবে চলতে থাকলে আমাদের যুব সমাজ বিপথগামী হয়ে যাবে, সবাই মুসলিম হয়ে যাবে। এতে জাতীয় ঐতিহ্য ভূলুন্ঠিত হবে, দেশ ও জাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তারা ইবনু দিগা'নাহর কাছে অভিযোগ করল। ইবনু দিগা'নাহ আবু-বাকর রাঃকে উচ্ছস্বরে তিলাওয়াত করতে বারন করেদিল। অন্যথায় তাকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হবে না বলে জানিয়ে দিল। আবু-বাকর ভাবলেন যার গোলামী করি তার আশ্রয়ই যথেষ্ট। অন্যকারো আশ্রয়ের কি প্রয়োজন..? তিনি কথাটি ইবন দিগা'নাহকেও জানিয়ে দিলেন।

পর্যালোচনাঃ আবু-বাকর রাঃর এ ঘটনা যেন বর্তমানের প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে দেশে দেশে মুসলিমদের একই অবস্থা। আল-কুরআনের প্রচার ও কুরআন মত জীবন চালাতে গেলেই যত সমস্যা, যত বাধ্যবাধকতা। তবে যে দেশের মানুষ আরবী বুঝে না সে দেশের নেতারা কুরআন তিলাওয়াতে বাঁধা দেয় না। বরং তারাও মাঝে মাঝে হুজুর ডেকে কুরআনের খতম ও শবিনা পড়িয়ে ধার্মিক সাজার তৃপ্তি অনুভব করে। এতে জনসমর্থন আদায়ের পথটাও সহজ হয়। কিন্তু কুরআনের বাণী বুঝাতে গেলেই তারা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। শুরু হয় অপবাদ, প্রপাগান্ডা, মিথ্যাচার ও নিয়ন্ত্রণ। আগের দিনে কমপক্ষে মাদরাসাহর দারসে বা মসজিদের মিম্বরে কুরআনের কথা বলা যেত। আস্তে আস্তে তাও নিয়ন্ত্রণের আওতায় চলে আসছে।

প্রতিক্রিয়াঃ ৩. কুরআনের মজলিসে হট্টগোলঃ রাসূল সা. কুরআনের বাণী প্রচার করতেন, লোকজনকে কুরআন বুঝাতেন, কুরআনের বিধান মেনে চলার আহ্বান জানাতেন, মানুষকে কুরআন শুনাতেন, কুরআনের দাওয়াত দিতেন। আর এটাই দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি। কুরআন দিয়েই মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

আমি (আল্লাহ) জানি তারা কি বলে। তুমি (নবী) তাদের উপর ক্ষমতাবান নও। তাই যে ব্যক্তি (আল্লাহর) হুঁশিয়ারিকে ভয় করে **কুরআন দিয়ে** তাকে উপদেশ দাও। (৫০ ক্বাফঃ ৪৫)

আরবী ছিল আরবদের নিজস্ব ভাষা। রাসূল সা. কুরআন শুনালে তারা কুরআনের মর্ম বুঝত এবং এর জ্ঞানগর্ভ বর্ননায় মানুষের অন্তর নড়ে উঠত। তাদের অন্তর চক্ষু খুলে যেত। মানুষ তখন ভালমন্দ বুঝে ফেলত। সকল বেড়াজ্বাল ছিন্ন করে জান্নাতের পথে চলে আসত। গ্রহণ করত আল্লাহর দ্বীন।

দাওয়ায়তের এমন পদ্ধতিতে বেইমান নেতারা পেরেশান হয়ে গেল। তারা ভাবলঃ যে করেই হউক এসব ঠেকাতে হবে, এদের রুখতে হবে, নতুবা সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমাদের মানসম্মান ধুলায় মিশে যাবে, আমাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব চলে যাবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে তারা কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। তারা কুরআন শুনতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। মানুষ যেন কুরআন শুনতে না পারে এজন্য চামচা বাহিনী লেলিয়ে দিল। বলে দিলঃ যেখানে কুরআন সেখানেই হট্টগোল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

কাফির(নেতা)রা (কুরআন শুনতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল) বললঃ কেউ কুরআন শুনতে যাবে না। (বিষয়টি তদারকির জন্য চামচাদের বললঃ কুরআনের আলোচনা হলে) হট্টগোল শুরু করবে। এভাবেই তোমাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে। (৪১ ফুসসিলাতঃ ২৬)

পর্যালোচনাঃ এই হচ্ছে সেকালের কাফিরদের অবস্থা। বর্তমানের কাফিররাও একই পথে চলছে। এখনো কুরআনের সামাজিক ও আক্বিদাহ বিষয়ক আয়াত নিয়ে আলোচনা হলে মাঝে মাঝে হট্টগোল করা হয়। যেসব আলিম এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন উনাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। উনাদের কাছে যেতে মানুষকে বারন করা হয়।

প্রতিক্রিয়াঃ ৪. লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনাঃ রাসূল সা. সাধারণত রাতের সালাতে উচ্ছস্বরে কুরআন পড়তেন। বাইহাকীসহ অনেক হাদিছের কিতাবে বর্নিত আছেঃ মুশরিক নেতারা রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনত।

পর্যালোচনাঃ যারা কুরআন শুনেছে তবে মেনে নেয়নি অর্থাৎ যারা কাফির, উল্লেখিত চার ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল তাদের। আর যারা কুরআন শুনে মেনে নিয়েছে তাদের থেকে আরো তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যথা..

প্রতিক্রিয়াঃ ৫. কিছু মানা আর কিছু না মানাঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা সমষ্টিগতভাবে কুরআন মেনে নিলেও বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের অনেক কিছুই মানে না। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছেঃ

- ✓ যদি বলা হয়ঃ আসো! (জীবন বিধান হিসেবে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলি। তারা বলেঃ আমাদের পুর্বসূরিরা যা মেনে এসেছেন এসবই যথেষ্ট। আচ্ছা তাদের পুর্বসুরিরা যদি অজ্ঞ ও ভ্রান্ত হয়? (মাইদাহঃ ১০৪)
- ✓ যদি বলা হয় আসো! (জীবন বিধান হিসেবে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলি। দেখবে মুনাফিকরা কেটে পরছে। (৪ নিসাঃ ৬১)
- ✓ তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? যারা এমন করে দুনিয়ায় তাদের জন্য লাঞ্ছনা, অপমান। আর আখেরাতে নিক্ষিপ্ত হবে অনন্ত জাহান্নামে। (২ বাকারাহঃ ৮৫)
- ✓ ...যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির। (৫ মাইদাহঃ ৪৪)

পর্যালোচনাঃ যারা কুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না; এরা কাফির। এমন মানুষ তখনও ছিল আর এখনো আছে।

প্রতিক্রিয়াঃ ৬. কুরআন শুনে মেনে নেয়াঃ তখনকার দিনে অনেক মানুষ কুরআন শুনে বিশ্বাস করেছে, মেনে নিয়েছে এবং কুরআন মত জীবন পরিচালনা করে নিজেকে ধন্য করেছে। যেমন..

আফ্রিকার বাদশাহ ছিল নাজ্জাশী। খৃষ্টান নাজ্জাশী মানবাধিকার ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। মুশরিকদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে বেশকিছু মুসলিম আফ্রিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মানবিক কারণে নাজ্জাশী মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছিল।

নাজ্জাশীর সাথে মক্কাহর মুশরিকদের ভাল সম্পর্ক ছিল। তারা নাজ্জাশীর কাছে প্রতিনিধিদল পাঠাল। তারা নাজ্জাশীকে বললঃ আমাদের কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদি, বিভ্রান্ত যুবক পালিয়ে এসে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এদের চিন্তা ভাবনা বড় ভয়াবহ। এরা দেশ, জাতি ও বিশ্ব শান্তির জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই এদেরকে আমাদের হাওয়ালা করুন। যেন বিচারের সম্মুখীন করে উচিত সাজা দেয়া যায়।

নাজ্জাশী মুসলিমদের ডাকলেন। তাদের বক্তব্য শুনলেন। নবী মুহাম্মাদ ও ইসলাম সম্বন্ধে কিছু ধারনা নিলেন। তারপর জানিয়ে দিলেনঃ আমি এদের ফিরিয়ে দিতে পারি না। তিনি মুসলমানদের আশ্রয় দিলেন। এবং নতুন নবী ও তার আদর্শের ব্যাপারে খুঁজ খবর নেওয়ার জন্য একটি উচ্চ শিক্ষিত প্রতিনিধিদল মক্কাহ পাঠালেন।

নাজ্জাশীর প্রতিনিধি দল মক্কাহ এসে রাসূল সাঃর সাথে সাক্ষাৎ করল। রাসূল সাঃ তাদের সূরাহ ইয়াসিন পড়ে শুনালেন। আল্লাহর কালাম শুনে তাদের অন্তর শীতল হয়ে গেল। চুখ দিয়ে বয়ে গেল বিনয়ের অশ্রু। তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে মুসলিম হয়ে গেল। তাদের ব্যাপারে নাযিল হলঃ

তুমি দেখবে, রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব শুনে তাদের চুখ অশ্রুতে ভিজে গেছে। তারা সত্য বুঝতে পেরেছে এবং বলেছে হে রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি। সাক্ষ্য দাতাদের তালিকায় আমাদের নাম লিখে নাও। (মাইদাহঃ ৮৩)

পর্যালোচনাঃ দুনিয়াতে এখনো এমন মানুষ বিদ্যমান আছে আল্লাহর কালাম শুনে যাদের অন্তর গলে যায়, চুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বিনয়ের অশ্রু। তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে। আল্লাহর কালামকে জীবনের গাইড হিসাবে মেনে নিয়ে নিজেকে ধন্য করে।

প্রতিক্রিয়াঃ ৭. কুরআনকে তার অধিকার দেয়াঃ রাসূলের সাহাবাগণ কুরআন পড়ে ছিলেন, কুরআন বুঝে ছিলেন। আল-কুরআনকে জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিয়ে এবং আল-কুরআনের কাছে আত্মসমর্পন করে আল-কুরআনের ন্যায় সঙ্গত অধিকার দিয়ে ছিলেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

- ✓ আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা পূর্ন অধিকার দিয়ে তা পাঠ করছে, তারা এর সকল বিধান মেনে নিয়েছে। আর যে বা যারা এ কিতাব অমান্য করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (২ বাকারাহঃ ১২১)
- ✓ তারা বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত। তথাপিও তারা (কুফরে) ফিরে যায়। (যারা এমন হয়ে যাবে) এরা মুঅমিন নয়। কারন বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নার) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় আর ব্যক্তিগত ফায়দার জন্য লালায়িত হয়ে ছুটে আসে। তবে কি এদের অন্তরেই রোগ, না এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংখা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও সাশন থেকে আল্লাহর আইন ও রাসূলের নীতি আদর্শকে বন্ধ দিয়ে এরা মহা পবিচার করছে।) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শুনলাম আর মেনে নিলাম। (যারা এমন করে) তারাই সফল। (নূরঃ ৪৭-৫১)
- ✓ বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে, মানবরচিত বা মনগড়া নীতি মেনে নয়। (যারা মনগড়া পথে চলে) তোমরা তাদের বর্জন করবে, যেন আল্লাহর বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে.. (৫ মাইদাহঃ ৪৯)

পর্যালোচনাঃ মক্কাহর লোকজন নিজেদেরকে ইবরাহীম আ.র অনুসারী মনে করত, তারা নিজেদেরকে ধার্মিক ভাবত। মনে করত তারা আল্লাহর ঘরের সেবক। তাই তারাই সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক। আর মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী, আত্মীয়তা ছিন্নকারী, সমাজ বিরোধী, ধর্মের নামে অথর্ব সৃষ্টিকারী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুরআন শুনার পর মক্কাহর নেতাদের থেকে চার ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস বারবার ঘুরে আসে। আজকালও যারা নিজেকে মুসলিম আর প্রকৃত মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ মনে করে থাকেন; কুরআনের ব্যাপারে তাদের থেকেও একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন..

১. এখনকার নেতারাও কুরআন শুনে, কুরআনের মাহফিলে যায়, তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করে। তবে বক্তা ও আলোচ্যসূচী হতে হয় তাদের পছন্দ মত।

ছোট বেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল। আমি তখন ছাত্র। বাজারের বড় মসজিদে তারাবী পড়াচ্ছিলেন একজন হাফিজ সাহেব। তিনি একজন খ্যাতনামা আলিমও ছিলেন। তিনি প্রতিদিন জোহরের পর তাফসীর পেশ করতেন।

তখন সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি সরগরম। আমাদের এলাকায় বেশ কয়েকজন কমরেড ছিল। যাদের জ্বালো জ্বালো শ্লোগানে মানুষ আতকে উঠতো। এই কমরেডদের কয়েকজনকে এবং বেশ কয়েকজন স্যকুলার নেতাকেও দেখতাম খুব আগ্রহ নিয়ে তাফসীর শুনতে আসত। বিষয়টি আমার কাছে কৌতূহলী মনে হত। আমি বুঝে উঠতে পারতাম না; ইসলামের নাম শুনলে যাদের গা-জ্বালা শুরু হয় তারা তাফসীর শুনার জন্য এতো আগ্রহী কেন?
তখন না বুঝলেও এখন বুঝি। আমার মনে আছে হাফিজ সাহেব সূরাহ ইউসুফের তাফসীর করছিলেন। উনি একজন সুবক্তা ছিলেন। উনার বাচন ভঙ্গিতে মনে হত ইহা এক লোমহর্ষক, হৃদয় বিদারক, রোমান্টিক কাহিনী। ইউসুফের সততা ও সরলতা, ভাইদের নিষ্ঠুরতা, বাবার অসহায়ত্ব, জুলেখার উন্মাদনা, রাজার স্বপ্ন ও এর তা'বির, ইউসুফ আঃর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে জেলে যাওয়া, ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এক মজাদার কাহিনী।

তাদের তাফসীর শোনার আগ্রহ দেখে মনে পড়ে আবু-জেহেল আবু-লাহাবদের কথা, যারা রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনত। কারন ক্বুরআনের যেসব সূরাহ মক্কাতে নাযিল হয়েছে এর অধিকাংশই ছিল কাহিনী। আর ক্বুরআনের ভাষা, বাচন ভঙ্গি, শব্দ চয়ন, সাহিত্য মান কত অপরূপ ও অদ্বিতীয়, যার কোনো তুলনা হয় না। তাই এসব কাহিনী শুনতে তাদের খুব আগ্রহ ছিল। আর এজন্য তারা রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে ক্বুরআন শুনত। ক্বুরআনের এসব কাহিনী শুনতে তখনো তাদের ভাল লাগত, এখনো লাগে। এতে তারা মজা পায়, আনন্দ পায়।
তাইতো যেসব হুজুর তাফসীর মাহফিলে শুধু কাহিনী শুনান; তাদের তাফসীর শুনতে এদের খুব আগ্রহ এবং বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তাফসীর মাহফিলে এমন সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন স্বনাম ধন্য বক্তাগণ। আর এমন তাফসীর শুনতে শুনতে সাধারণ মানুষের ধারনা জন্মেছে আল-ক্বুরআনে শুধু কিচ্ছা কাহিনীই বর্নিত হয়েছে। তাইতো এক ব্যক্তিকে দরসে ক্বুরআনের দাওয়াত দিলে উনি বলেছিলেনঃ এসব কাহিনী আমার জানা আছে।

২. মুশরিকদের জাতীয় ঐতিহ্য ছিল মুর্তি সংস্কৃতি ও মুর্তিপ্রীতি। তাদের প্রয়াত নেতারা ছিল মুর্তির ভক্ত ও মুর্তি পূজারী। তাদের মুর্তি সংস্কৃতিকে ভ্রান্ত নীতি ও মুর্তি পূজারীদের জাহান্নামী আখ্যায়িত করে আয়াত নাযিল শুরু হলে মুশরিকদের ভিত কেপে উঠে। এতে তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সরাসরি আঘাত লাগে। তাই ক্ষেপে উঠে মুশরিক সমাজ, শুরু হয় হট্টগোল। যার প্রতিধ্বনি শোনা যায় আজকাল দেশে দেশে।
আল-ক্বুরআনের যেসব আয়াতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহকেই সবকিছুর উৎস বলা হয়েছে। দ্বীনহীন নীতিকে ভ্রান্ত ও নেতাদের কাফির বলা হয়েছে এসব আয়াত শুনার পর ইসলাম বিদ্বেষী বেইমানরা তখনো হট্টগোল করেছিল, এখনো করছে।

৩. আল-ক্বুরআনের যেসব আয়াতে হুদুদ ও দন্ডবিধির কথা বলা হয়েছে। সমাজ গঠন, দেশ পরিচালনা, বিচার ও শাসনের কথা বলা হয়েছে, এসব আয়াতের তাফসীর করলে এখনো তাই করা হয় যা করা হয়েছিল আবু-বাকর রাঃর সাথে।
এখনো তারা প্রকাশ্যে ক্বুরআনের বিরোধিতা করতে পারে না। তবে হুজুরদেরকে সাবধান করে দেয়া হয় যেন যত্রতত্র এসব ওয়াজ না করেন। কোনো হুজুর সাহস করে বলে ফেললে তাকে গ্রেফতার করা হয়, মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়, অত্যাচার করা হয়, প্রয়োজনে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

৪. আল-ক্বুরআনে বেশ কিছু আয়াতে জিহাদ, ক্বিতাল, ইসলামী সমাজ কায়েমের আদেশ, নীতিমালা ও মানুষের জীবন বিধান বর্নিত হয়েছে। এসব আয়াতের তাফসীর করলে বেইমানদের গা-জ্বালা শুরু হয়, তারা তেড়ে আসে, যেমন এসেছিল আ'ওরাহ। তবে এখন তাদের হাতে পুথা থাকে না, থাকে অন্যকিছু।

তখন ও এখনঃ তবে দুঃখের ব্যাপার হল ক্বুরআনের বাণী শোনে এখনকার বেইমানরা তখনকার মুশরিকদের মত প্রতিক্রিয়া দেখালেও এখন আমরা তখনকার মুসলিমদের মত অনড় অবস্থানে নেই।

- সেদিন আ'ওরাহর পুথা মুহাম্মাদ সাঃর কন্ঠ স্তব্দ করতে পারেনি। কিন্তু আজ তাদের চুখের ইশারা আমাদের স্তব্দ করে দিচ্ছে।
- সেদিন ইবনু দিগা'নাহর ঘোষণা আবু-বাকরকে থামাতে পারেনি। কিন্তু আজ তারা আমাদের থামিয়ে দিচ্ছে।
- তখন তাদের হট্টগোল মুহাম্মাদ সাঃর দাওয়াত বন্ধ করতে পারেনি কিন্তু এখন আমাদের দাওয়াতকে বন্ধ করে দিচ্ছে
- শুধু তখনকার নেতাদের লুকিয়ে লুকিয়ে ক্বুরআন শোনা আর এখনকার বেইমানদের ক্বুরআনের কাহিনী শোনার প্রচলন তখনো ছিল, এখনো আছে।
- আর যারা মুনাফিক। যারা আল-ক্বুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না। বিচার, শাসন, হুদুদ সম্পৃক্ত আয়াত সমূহ মেনে নিতে তখনো তাদের আপত্তি ছিল, এখনো আছে। এসব আয়াত তখনো তারা মেনে নেয়নি, এখনো নিচ্ছে না। তাই তাদের প্রতিক্রিয়া সেকালে ও একালে একই। তবে তখন মুসলিম সমাজে এরা ছিল গুরুত্বহীন। সমাজের নেতৃত্ব মুঅমিনদের হাতে ছিল

বিধায় এরা সদা ভয়ে ভয়ে থাকত। আর এখনকার সমাজে এরাই কর্তা। সমাজের চাবিকাটি এদেরই হাতে। তাই এখন মুঅমিনগণকে ভয়ে ভয়ে সময় কাটাতে হয়।

- মুঅমিনগণ তখন যেভাবে ক্বুরআন শোনে কেঁদেছিল, আল-ক্বুরআনের কাছে আত্মসমর্পন করেছিল, জীবনের গাইড হিসাবে আল-ক্বুরআনকে মেনে নিয়েছিল, এখনো তাই করছে। তারা তখনো ক্বুরআনের জন্য হাসি মুখে জীবন উৎসর্গ করত, এখনো করছে। তবে এমন মুঅমিনের সংখ্যা তখন অনেক বেশী ছিল আর এখন খুব কম।

সারকথাঃ সুতরাং আমাদেরকে এসব বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আল-ক্বুরআনকে কে কিভাবে নিল এবং আল-ক্বুরআন শুনে কে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাল, ইহা খিয়াল করতে হবে। এবং এরই আলোকে মানুষকে মূল্যায়ন ও চিহ্নিত করতে হবে। এমন হতে পারলে সঠিক পথে চলা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া আমাদের জন্য সহজ হবে। ইনশা আল্লাহ। হে আল্লাহ! আপন করুণায় আমাদেরকে মুঅমিনদের কাতারে শামিল কর।

অনুচ্ছেদঃ ১০. আল-কুরআনের কয়েকটি বিশেষ পরিভাষা ও শব্দ পরিচিতি

যে কোনো আদর্শ, দর্শন, মতবাদ বা জ্ঞানের জন্য পরিভাষা বা শব্দ পরিচিতি খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের পরিভাষা বা শব্দ পরিচিতির উপরই নির্ভর করে আপনি এ বিষয় কতটুকু বুঝেছেন। কোনো দর্শন বা বিষয়কে সঠিকভাবে বুঝার জন্য শুধু শব্দের আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থই যথেষ্ট নয়। যেমনঃ "কুরআন আল্লাহর কিতাব"। এখানে কুরআন শব্দের শাব্দিক অর্থ পঠিত তথা যা পাঠ করা হয়েছে। আর পারিভাষিক ভাবে "আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের নাম কুরআন। তাই "কুরআন আল্লাহর কিতাব" এ বাক্যটির সঠিক মর্ম বুঝতে হলে "কুরআন" বলে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবই বুঝতে হবে, পঠিত যে কোনো বই নয়।

সুতরাং আশা করি পরিভাষার গুরুত্ব উপলব্দি করতে এবং বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। আল-কুরআনের মর্ম বুঝতে হলে অবশ্যই এর পরিভাষা বুঝতে হবে। আর আল-কুরআনের পরিভাষা বুঝার জন্য আপনাদেরকে সহযোগিতা করতেই আমাদের এ উদ্যোগ।

পরিভাষাঃ ১. ইবাদাত পরিচিতিঃ ইবাদাত আরবী শব্দ। আমাদের বাংলা সমাজে উর্দু উচ্চারনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "এবাদত"। ইবাদাত শব্দের শাব্দিক অর্থ দাসত্ব করা, উপাসনা করা, পূজা করা, ইত্যাদি। আর পারিভাষিকভাবে ইবাদাত বলা হয়..

আল্লাহর ইবাদাত আর অন্যের ইবাদাত আবার সমান নয়। এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে..

- নিজের উপর মহান আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিতে হয় তথা মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কারো প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া যাবে না।
- পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনতে হয় তথা আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধান ও তথ্যসমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না।
- আল্লাহর দেওয়া ও রাসূলের আনীত যাবতীয় আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে নৈতিক ও আদর্শিক ভাবে মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান, রীতিনীতি বা মতবাদ মেনে নেওয়া যাবে না।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে এককভাবে মহান আল্লাহ প্রদত্ব দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে নীতিগত ভাবে মেনে চলতে হয়।

তাই মহান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে, নিজেদের জীবন ও সত্বার উপর এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তথা পরিপূর্ন ঈমানের সহিত বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

ইবাদাত নিয়ে বিভ্রান্তিঃ ইবাদাত নিয়ে বিভ্রান্তি মানব সমাজের অতি প্রাচিনতম বিষয়। যুগযুগ ধরেই মানব সমাজে ইবাদাত বা পূজার নামে মনগড়া ও বানানো নানা পন্থা, পথ ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন..

উদাহরনঃ ১. অবস্থানঃ নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে বা নির্ধারিত স্থাপনার সামনে অবস্থান করা ইবাদাত বা পূজার একটি সনাতন পদ্ধতি। (দেখুন সূরাহঃ আম্বিয়াঃ ৫২)

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রেখেছে। যেমনঃ হাজ্জ করতে গিয়ে যুল-হিজ্জাহ মাসের ৯ তারিখের দিনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে আর সূর্যাস্তের পর থেকে রাতে মুজদালিফায় এবং এরপর ২/৩দিন মিনায় অবস্থান করতে হয়।

সুতরাং নির্ধারিত দিনতারিখে নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি বা স্থাপনায় অবস্থান নেওয়া বা অবস্থান করা অবশ্যই ইবাদাতের শামিল হবে এবং এমন করলে শিরক হবে।

উদাহরনঃ ২ দাড়িয়ে থাকাঃ বিশেষ কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সম্মানার্থে তার সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়িয়ে থাকা ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। আর ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু আছে। যেমনঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন "তোমরা (সালাতে) আল্লাহর সম্মানার্থে (বিশেষ পদ্ধতিতে) চুপচাপ/অনুগত হয়ে দাড়িয়ে থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২৩৮)

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থাপনার জন্য এওমন কিছু করলে অবশ্যই এটা শিরক হিসেবে গন্য হবে।

উদাহরনঃ ৩. ভোগ বা ভেটঃ ভোগ বা ভেট দেওয়া ইবাদাতের আরো একটি সনাতন পদ্ধতি। আমাদের সমাজের হিন্দু লোকেরা তাদের দেব/দেবীর তরে ফুল/ফল/খাদ্যদ্রব্যসহ নানানকিছু ভোগ বা ভেট দিয়ে থাকে।

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রয়েছে। ইসমালী পরিভাষায় এটা সাদাক্বাহ নামে পরিচিত। আমরা আমাদের নানা বস্তু আল্লাহর নামে সাদাক্বাহ করি এবং গরীব ও অসহায়দের মাঝে বিতরন করে থাকি। সুতরাং নিয়ম করে আল্লাহ ছারা অন্যকিছুর তরে এমন করলে এটা শিরক হিসেবে গন্য হবে।

উদাহরনঃ ৪. পশু জবেহঃ আনুষ্ঠানিকভাবে পশু জবেহ ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। যুগযুগ ধরেই মানুষ তাদের ইশ্বরের নামে আনুষ্ঠানিকভাবে পশু জবেহ করে আসছে।
ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় এরনাম কুরবানী বা উদ্বহিয়্যাহ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।
সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে অথবা নির্ধারিত কোন স্থাপনাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাতে পশু জিবেহ করা অবশ্যই শিরক হিসেবে গন্য হবে। যেমনঃ কোনো মূর্তী, কোনো পীর বা কোনো মহানব্যক্তির নামে পশু জবেহ করা অথবা কোন মাজার, কোনো গাছ, কোনো বিশেষ স্থান বা স্থাপনাকে মহান ও পবিত্র মনে করে সেখানে গিয়ে পশু জবেহ করা।

উদাহরনঃ ৫. বর্জনঃ কারো সন্তুষ্টির জন্য কোনকিছু বর্জন করা ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। সনাতন ধর্মের নামে এখনো অনেক মানুষের মাঝে এসব পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।
ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রয়েছে। যেমনঃ

- হাজ্জ, উমরাহ ও সালাতরত অবস্থায় আমরা অনেক হালাল বিষয় ও বর্জন করে থাকি তাইতো হাজ্জা ও উমরাহর সুচনাকে বলা হয় "ইহ'রাম" আর সালাতের সূচনাকে বলা হয় "তাহ'রীমাহ" আর এ উভয়টির অর্থই হারাম বানানো।
- সাওম বা রোজাতেও আমরা শুধুই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সময়ে খাদ্য, পানীয় ও যৌনাচার বিসর্জন দিয়ে থাকি।

সুতরাং আল্লাহ ছারা অন্যের জন্য এমনকিছু করা অবশ্যই শিরক হিসেবে গন্য হবে।

উদাহরনঃ ৬. রুকু বা সিজদাহ করাঃ রুকু ও সিজদাহ ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। বিশেষ কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা স্থাপনার সামনে মাথা নত করে রুকু করা বা সম্পূর্ন নত হয়ে সিজদাহ করার রীতি এখোনো প্রচলত আছে।
ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও খুবই গুরুত্বপূর্ন। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ "ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা রুকু কর, সিজদাহ কর, তোমাদের রাব্বের ইবাদাত কর আর কল্যানকর কাজ কর, এতে তোমরা সফল হতে পারবে"। (হাজ্জঃ ৭৭)
সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে এটা ইবাদাত হিসেবে গন্য হবে এবং শিরক হবে।
ইবাদাত করতে হবে শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা অন্য কোনকিছুর ইবাদাত করা যাবে না। আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে আল্লাহর মনোনিত দ্বীন ও আদর্শ মেনে।

পরিভাষাঃ ২. দ্বীনঃ দ্বীন শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রতিফল ও প্রতিদান। উত্তম প্রতিদান ও প্রতিফলের জন্য যেসব নীতিমালা, দর্শন ও আদর্শ মেনে মানুষ তাদের বাস্তবজীবন পরিচালনা করে এটাই তার দ্বীন হিসেবে বিবেচিত হয়।
মহান আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও মনোনিত যে আদর্শ, দর্শন ও নীতিমালা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এটাই আল্লাহর দ্বীন। আমাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম।

পরিভাষাঃ ৩. ইসলাম পরিচিতিঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা। মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়ার নাম ইসলাম গ্রহন করা আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করল তাকে বলা হয় মুসলিম।
ইসলাম তথাকথিত শুধু ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। বাস্তব জীবনের সকল বিষয়েই মূলনীতি ও বিধান ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। ইসলামে যেমন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে। তেমনি রয়েছে সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বানিজ্য ও ব্যাংকিং নীতিমালা, শিক্ষানীতি, প্রতিরক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি বা সমরনীতি, দেশ জাতি ও সমাজ গঠন এবং পরিচালনার নীতিমালা, আইন বিচার ও শাসন, চুক্তি ও শপথ করা এবং রক্ষা করার নীতিমালা, শ্রমনীতি, প্রবাসনীতি, এসাইলেম বা শরণার্থীনীতি, ইত্যাদি সবকিছু।
সুতরাং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান ও রিতিনীতি মেনে নেওয়া ও মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করার নাম ইসলাম গ্রহন করা আর বাস্তব জীবনে এসকলকিছু মেনে চলার নামই ইসলাম মেনে চলা।

যে ব্যক্তি ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করে এবং শুধুমাত্র ধর্ম হিসেবেই মানে তথা শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলাম আর অন্য ব্যাপারে অন্য নীতি, আদর্শ, দর্শন বা মতবাদ মেনে চলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।
আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করাই ইসলামের মূলবিষয়। নিজের আত্মসম্মান, চিন্তা চেতনা, ইবাদাত আরাধনাসহ সবকিছু আল্লাহর কাছে সপে দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব করাই আত্মসমর্পনের মূল কথা এবং এটা-ই একজন মুসলমানের আসল কাজ।
নবী সাঃর হাদীছ থেকে জানা যায়ঃ ৫টি মূলনীতি মেনে ইসলাম গ্রহন করতে হয় তথা ইসলামের মূলনীতি বা মূল বিষয় ৫টি। যথা..

১. শাহাদাহঃ শাহাদাহ অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। শাহাদাহ ইসলামের প্রবেশ দ্বার। দুটি সাক্ষ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। আর এ সাক্ষ্য দুটি হচ্ছে..

- আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই
- মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল

২. সালাত কায়েম করাঃ ইসলামের সালাত আমাদের সমাজে নামায হিসেবে পরিচিত। আর কায়েম অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা। সালাত কায়েম করতে হয় দুই ভাবে। যথা ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে।

ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েমকরাঃ নিয়মিত ও সময়মত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাম কায়েম করা। নিয়মিত সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে সূরাহ মায়া'রিজের ২৩ তম আয়াতে আর সময়মত সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ১০৩ তম আয়াতে।

সমাজ জীবনে সালাত কায়েম করাঃ মসসজিদ বানিয়ে নিয়মিত জামায়াতের সহিত সালাত আদায় করা এবং নিয়মিত সালাত হচ্ছে কি না আর সবাই সালাত আদায় করছে কি না এ ব্যাপারে যথাযথ তদারকি করার নাম সমাজে সালাত কায়েম করা। যে কথার প্রতি পবিত্র কুরআনে বারবার ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যে কথার বাস্তব নমুনা রাসূল সাঃ ও খুলাফা রাশিদীনের বাস্তব অনুশীলন থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

৩. যাকাত আদায় করাঃ ইসলামী পরিভাষায় যাকাত একটি অর্থ ব্যবস্থার নাম। ইসলামী সরকার ধনী মুসলিমদের থেকে হিসাব করে তাদের সঞ্চয় ও ব্যবসার পন্য থেকে বাতসরিক ২.৫% করে উসুল করে নির্ধারিত খাতে খরচ করবে। এটাই যাকাতের মূল কথা। তবে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত না থাকলে বা সরকার যাকাত আদায় না করলে মুসমিম জনতা তাদের নিজ উদ্যগে যাকাত দিতে হবে বলে ফাক্বীহগন সর্বসম্মত মতামত দিয়েছেন।

৪. সাওম পালন বা সিয়াম সাধনঃ ইসলামের সাওমকে আমাদের সমাজে বলা হয় "রোজা" আর সিয়ামসাধনকে বলা হয় "রোজা রাখা"। আরবী রামাদ্বান মাসে পুরা মাস সাওম পাকন করা মুসলিমদের ফরজ দায়িত্ব। এটা ইসলামের ৪র্থ মূল বিষয়। উল্লেখ্য আরবী মাস ২৯ দিনেও হতে পারে আবার ৩০ দিনেও হতে পারে।

৫. আল্লাহর ঘরে হাজ্ব সম্পাদন করাঃ ইসলামের ৫ম মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ঘরে হাজ্ব সম্পাদন করা। সরকার প্রতি বছর যু-ল-হিজ্জাহ মাসে হাজ্বের ব্যবস্থা করবে এবং যাদের হাজ্ব করার সাধ্য ও সামর্থ আছে এমন মুসলিম জনতা এ মাসের ৮-১৩ তারিখ পর্যন্ত হাজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে।

পরিভাষাঃ ৪. মুসলিম পরিচিতিঃ মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পনকারী। মহান আল্লাহর কাক্সহে আত্মসমর্পন করে সকল প্রকার ত্বাগূত্বকে বর্জন করে আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মাদ সাঃর রিসালতের সাক্ষ্য দিয়ে তথা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিম হতে হয়। মুসলিম হবার পর জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হয়, নিজের ঈমানকে মজবুত করতে হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে, রাসূলের আদর্শ মত জীবন পরিচালনা করতে হয়। আর এসব করতে গিয়ে মুসলিমগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথাঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

ক- মুঅমিনঃ যে মুসলিম..

- ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল,
- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে নিল ও মেনে চলল সে-ই মুঅমিন। প্রতিটি মুঅমিনই আল্লাহর ওয়ালী, মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তাকে শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

খ- ফাসিকঃ যে মুসলিম..

- ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল,
- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল
- বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয়বিধান নীতিগতভাবে মেনেও নিল তবে সঠিকভাবে মেনে চলল না তাকে ফাসিক বলা হয়।

ফাসিক পরকালে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ ইচ্ছা হলে ফাসিককে মাফ করে দেবেন আর ইচ্ছা হলে জাহান্নামে সাজা দেবেন। তবে ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। সাজা ভোগের পর তাদেরকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক লোকদের শাফায়া'তে (সুপারিশে) অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তার জন্য শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

গ- মুনাফিকঃ যে মুসলিম ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের বিশ্বাসে অবিচল নয় অথবা ত্বাগূতকে বর্জন করেনি সে মুনাফিক হয়ে যায়। অন্যকথায় যে মুসলিম নিজেকে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে অথবা যে মুসলিম ইসলামের কোনো নীতি বা বিধানকে অপছন্দ করে সে মুনাফিক হয়ে যায় (চাই আমল যতই করুক।)

মুনাফিক মানুষের কাছে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ ৯ তাওবাহঃ ৮৪)

ইসলাম গ্রহন করার পর বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতির নাম "হানীফ" পদ্ধতি।

পরিভাষাঃ ৫. হানীফ পদ্ধতিঃ ইসলাম ছাড়া অন্য যত দর্শন, আদর্শ, মতবাদ ও নীতিমালাসহ সকলকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ইসলামী নীতি, আদর্শ ও বিধিবিধান নেওয়া ও মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে ইসলাম মেনে চলা।

আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আবার নির্ধারিত কিছু শর্ত রয়েছে, এসবের অন্যতম দুটি হচ্ছে ঈমান ও ইখলাস্ব।

পরিভাষাঃ ৬. ঈমান ও মুঅমিন পরিচিতিঃ ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে মুঅমিন বলা হয়। জান্নাতে যেতে হলে শুধু ইসলাম গ্রহন করাই যথেষ্ট নয় বরং অবশ্যই ঈমানের অধিকারী হতে হবে। ঈমান আখেরাতে মুক্তির সনদ, ঈমান আমল কবুলের পূর্বশর্ত। জান্নাতে জেতে হলে অবশ্যই পরিপূর্নভাবে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানের সহিত নেক-কাজ করতে হবে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং এজন্য কাজ করে সে যদি মুঅমিন হয়ে থাকে তবে তার এ কাজ ফলপ্রসু হবে। (ইসরাঃ ১৯)

ঈমান আনতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- ঈয়ানের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় (আর এটা-ই ঈমানের মূল বিষয়। ঈমানের এ অংশটি আমাদের সমাজে আক্বীদাহ নামেও খ্যাত। বিশ্বাসে নড়বড়ে হলে ঈমান হয় না বরং এটাকে কুফর বলা হয়।)
- ঈমানের ঘোষণা দেওয়া। (এটা ঈমানের সামাজিক দিক। ঘোষণা না দিয়ে নিজের ঈমানকে গোপন রাখলেও ঈমান হয়ে যায়। দেখুন গাফিরঃ ২৮)
- বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। (বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে না পারলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅমিন তথা ঈমানদার থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায় এবং তাঁর আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।)

ঈমান আনার পর মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকতে এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি এবং পাপাচার থেকে বেচে থাকতে হয়। উল্লেখ্য ঈমান বিনষ্টকারী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সকল ইবাদাত ও আ'মাল নস্যাত ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন ওই ব্যক্তি আর মুঅমিন থাকে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামি হয়ে যায়। আর কবীরাহ গোনাহ করলে তথা পাপাচারে জড়িয়ে পড়লে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় আর ওই ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যায়, তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।

পরিভাষাঃ ৭. আমল পরিচিতিঃ আমল অর্থ কাজ। বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে যাকিছু করা হয় এসবকে বলা হয় সৎকাজ, নেককাজ বা আমলে সালেহ। আ'মাল বলতে আমরা এসব কাজকেই বুঝে থাকি।

যে আমল আল্লাহর কছে কবুল হবে আখেরাতে এর ছাওয়াব পাওয়া যাবে আর যে আমল কবুল হবে না আখেরাতে এজন্য কিছুই পাওয়া যাবে না।

আমল কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তাই আমল করার আগে এসব শর্ত পুরন করতে হয় এবং তারপর আমল করলে এ আমল কবুল হয়। আমল কবুল হওয়ার শর্ত সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ..

শর্ত ১ ঈমানঃ আমল কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতীত আমল কবুল হয় না। ইরশাদ হচ্ছে..

যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং এজন্য কাজ করে সে যদি মুঅমিন হয়ে থাকে তবে তার এ কাজ ফলপ্রসু হবে। (ইসরাঃ ১৯)

শর্ত ২ ইখলাস্বঃ আমল কবুল হওয়ার আরো একটি শর্ত হচ্ছে ইখলাস্ব। ইখলাস্ব অর্থ ভেজালমুক্ত। আল্লাহ কেবল ভেজালমুক্ত আমল ও ইবাদাতই গ্রহন করে থাকেন। ভেজাল যুক্ত কোন কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হয় না। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ সুতরাং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (গাফিরঃ ১৪)

ভেজালমুক্ত আমল ও ইবাদাত মানে হচ্ছে আল্লাহর কিতাবে বর্নিত আমল ও ইবাদাত। ইরশাদ হচ্ছে..

(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি কিতাবটি নাযিল করেছি যথাযথভাবেই। সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (যুমারঃ ২)

আল্লাহর কথা মেনে রাসূল সাঃও ভেজালমুক্ত থেকেই আমল ও ইবাদাত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে

বলে দাও! আমি শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করি শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (যুমারঃ ১৪)

আমল ও ইবাদাতকে ভেজালমুক্ত রাখতে হলে ৩টি কাজ করতে হবে। যথা ..

- নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে। একে বলা হয় সাহীহ নিয়ত বা ভেজালমুক্ত নিয়ত।
- কর্মকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে তথা কোনো প্রকার সংযোজন বা বিযোজন করা যাবে না।
- নিজের জিবন আদর্শকে ভেজালমুক্র রাখতে হবে আর এতাকেই বলা হয় ভেজালমুক্ত দ্বীন।

শর্ত ৩ নবী সাঃর অনুকরনঃ আমল ও বাদাত কবুলের আরো একটি শর্ত হচ্ছে নবী সাঃর অনুকরন। নবী সাঃর অনুকরন ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা বা তরীকাহ মেনে আমল বা ইবাদাত করলে এটা কবুল করা হয় না।

শর্ত ৪ রিয়া মুক্ত থাকাঃ রিয়া অর্থ লোক দেখনো। লোক দেখানো কোনো কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।
শর্ত ৫ আহকাম ও আরকানঃ আহকাম অর্থ বিধিবিধান আর আরকান অর্থ মূলবিষয় বা মূলনীতি। অর্থাত আমল ও ইবাদাতের যেসব বিধিবিধান ও নিয়ম নীতি রয়েছে এগুলো মেনেই কাজটি করতে হবে। নতুবা একাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।
শর্ত ৬ হারাম মুক্ত থাকাঃ অর্থাত যে ব্যক্তি আমল করেছে তাকে অবশ্যই হারাম মুক্ত হতে হবে। হারাম খাদ্য, হারাম পানীয়, হারাম পশাক, ইত্যাদি ব্যবহার করে আমল করলে ওই আমল বা ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

আর উল্লেখিত শর্ত মেনে আমল সম্পাদন করার পর এ আমল ও এর ফলকে নস্যাত হওয়া থেকে বাচিয়ে রাখতে হবে। কারন এমনকিছু পাপ রয়েছে যা করলে আমল ও ইবাদাতের ফল বা প্রতিদান তথা ছাওয়াব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যেমন ..

- **কুফরঃ** সনাতন বা আধুনিক যে কোন প্রকার কুফরে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ
- **শিরকঃ** সনাতন বা আধুনিক যে কোন প্রকার শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ
- **অপছন্দঃ** আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো তথ্য, বিধান বা অন্যকিছু অপছন্দ করলে সকল আমল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ
- **খোটা দেওয়াঃ** দান, অনুদান বা সহযোগিতা করার পর গ্রহিতাকে খোটা দিলে এর ছাওয়াব নস্যাত হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ
- **কষ্ট দেওয়াঃ** দান, অনুদান বা সহযোগিতা করার পর গ্রহিতাকে এ বিষয়ে কষ্ট দিলে এর ছাওয়াব নস্যাত হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ

পরিভাষাঃ ৮. ত্বাগূতঃ ঈমানের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ত্বাগীত বর্জন। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহনযোগ্য হয় না। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ দ্বীন গ্রহনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, (কারন) বিভ্রান্তি (র বেড়াজাল) থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল আর এক আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এমন এক আদর্শকে আকড়ে ধরল যে থাকা আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহঃ ২৫৬)

ত্বাগু'ত পরিচিতিঃ ত্বাগীত শব্দটি এসেছে ত্বুগ'ইয়ান থেকে। ত্বুগ'ইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। সে মতে আল্লাহ রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি ও ব্যক্তি বর্গকে ত্বাগু'ত্ব বলা হয়। সব চেয়ে বড় ত্বাগু'ত্ব শয়তান। পবিত্র কুরআনের অনেক জাগায় ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে ত্বাগু'ত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিভাষাঃ ৯. তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করল তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যক্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।
১ম স্তরের তাকওয়া অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হল সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবে এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।
২য় স্তরের তাকওয়া আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হল সকল প্রকার কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।
৩য় স্তরের তাকওয়া পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ্-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

পরিভাষাঃ ১০ আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা পরিচিতিঃ
আল-ওয়ালাঃ আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না। এসম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় একে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"। এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন।
ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে মেনে চলার মত আইন ও বিধানের মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। শত্রু ও মিত্র নির্ধারন মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই এবিষয়েও সঠিক এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ ঈমানের উপর অবিচল থাকা।
ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, নীতিনির্ধারক, ইত্যাদি। ওয়ালী সম্পর্কে আল-কুরআনে যেসব কথা বলা হয়েছে এর সারসংক্ষেপ হল..
১. আল্লাহ সকল মুঅমিনের ওয়ালী। (বাক্বারাহঃ ২৫৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ সকল মুঅমিনের জন্য একমাত্র কর্তৃত্বশীল নীতিনির্ধারিক।
২. আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ওয়ালী নেই। (বাক্বারাহঃ ১০৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ ছারা অন্যকে কর্তৃত্বশীল বা নীতিনির্ধারিক হিসেবে মানা যাবে না।
৩. এক মুঅমিন অন্য মুঅমিনের ওয়ালী। (তাওবাহঃ ৭১) এর মানে হচ্ছে দুনিয়ার সকল মুঅমিন অন্য সকল মুঅমিনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল মিত্র।
৪. কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো যাবে না। (নিসাঃ ১৪৪) এর মানে হচ্ছে কোনো কাফিরকে অভিভাবক বা মিত্র বানানো যাবে না।

৫. যে সব মুসলিম আত্মীয়-স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসবে তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহন করা যাবেনা। (তাওবাহঃ ২৩) এর মানে হচ্ছে তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না।

আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না। এসম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"। এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন। যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। যেমন..

- পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- আল্লাহ্ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- এমনকি বাবা-মা ভাইবোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
- চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

পরিভাষাঃ ১১. ক্বুনূত পরিচিতিঃ ক্বুনুত অর্থ পূর্ন অনুগত, একাগ্রতা, দীর্ঘ রুকু সিজদাহ, দীর্ঘ কিয়াম, অবনত শীর, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একাগ্রতা, পূর্ন নিরবতা ইত্যাদি।

পরিভাষাঃ ১২. শোকর পরিচিতিঃ অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর আদায় করা।

পরিভাষাঃ ১৩. সবর পরিচিতিঃ সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ় ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।

পরিভাষাঃ ১৪. খুশু' পরিচিতিঃ অন্তর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে একান্ত বিনীত ভাবে এবাদত করাকে খুশু' বলা হয়

পরিভাষাঃ ১৫. শয়তান পরিচিতিঃ যে বা যারা অন্যকে কুমন্ত্রণা দেয় বা কুপথে প্ররোচিত করে সে-ই শয়তান। শয়তান মানুষ হতে পারে, জিন্ন হতে পারে। সূরাহ বাক্বারার ১৪তম আয়াতসহ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। শয়তান হতে পারে আমাদের সমাজের কেউ, পরিবারের কেউ অথবা বন্ধুবান্ধবদের কেউ। তাই উক্ত আয়াতসহ অনেক জায়গায় শয়তান শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে।
যে বা যারা কুফর করে শয়তান তাদের মিত্র ও আপন হয়ে যায় এবং তখন শয়তান হয়ে যায় তার উপর প্রভাবশালী শক্তি। তাই সে দিনে দিনে মন্দের দিকে ধাবিত হয়।

পরিভাষাঃ ১৬. সালাত পরিচিতিঃ আরবী মূল শব্দ হল স্বালাহ এবং এর বহুবচন হল স্বালাওয়াত। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় সালাত। আরবী অবিধানে সালাহ শব্দের অনেকগুলো অর্থ লিখা হয়েছে এর অন্যতম ৩টি হল প্রার্থনা, ইবাদাহ ও দ্বীন। সে মতে সালাত কায়েম করার অর্থ দাঁড়ায় মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, মহান আল্লাহর এবাদত করা তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা তথা আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

আবার কর্তা হিসেবে রহমত মাগফিরাত এবং দুরুদ অর্থেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন..

- "আল্লাহ বান্দাকে সালাত করেন" এর অর্থ হবে আল্লাহ বান্দার উপর রহমত করেছেন।
- "ফিরিস্তা আমাদের জন্য সালাত করেন" এর অর্থ হবে ফিরিস্তা আমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন
- "আমরা আল্লাহর জন্য সালাত করি" এর অর্থ হল আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহর ইবাদাত করি এবং আল্লাহর দ্বীন মেনে চলি
- আমরা রাসূলের উপর সালাত করি এর অর্থ দাঁড়াবে আমরা রাসূলের উপর দুরুদ পাঠ করি। (সালাত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৩ ও ৪৩)

সালাতঃ সালাত কায়েম করতে হয় দুই ভাবেঃ ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে।
ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েমঃ ব্যক্তিগত ভাবে নিয়মিত এবং সময়মত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা।
সমাজে সালাত কায়েমঃ মাসজিদ বানিয়ে জামায়াতে সালাতের ব্যবস্থা করা এবং সবাই নিয়মিত ও সময়মত সালাত আদায় করছে কি না এর তদারকি করা এবং সবাইকে সালাতের আদেশ দেওয়া আর কেউ সালাত ছেড়ে দিলে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। সমাজে এমন ব্যবস্থা চালু থাকার নাম সমাজ জীবনে সালাত কায়েম করা। সমাজে সালাত কায়েম করার মূল দায়িত্ব ইসলামী সরকারের।

পরিভাষাঃ ১৭. জাতীয় ঐক্যঃ ইসলামের মূল শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য। দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একতাবদ্ধ, একই সমাজ ভুক্ত, একই নেতা ও একই শাসনের আওতাধীন। মুসলিম ঐক্যের একক ফর্মূলার নাম খিলাফাহ। আল্লাহর আদেশ পালন করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করে ছিলেন রাসূল সাঃ। পরে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছিলেন খালীফাহগণ। প্রথমে খুলাফা রাশিদীন, তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ, তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ, সবশেষে উছমানী খিলাফাহ। কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খালীফাহ। রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরি সমাজ। কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মনগড়া বিধান। এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি। মুসলিম জাতীয়তাবাদের জাগায় চালু হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। খিলাফাহর জাগা দখন করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি। ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি। ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জাগায় চালু হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি। এভাবে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

- উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)
- যারা বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে তথা দলাবাজি করে তারা যতই মসলক, মিনহাজ বা মযহবের দোহাই দেক না কেন আসলে এসবের মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হিংসা বিদ্বেষ। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)
- যারা উম্মের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুন ৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)
- আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)
- সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাস্য মতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

পরিভাষাঃ ১৮. মুহসিন পরিচিতিঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহ'সানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহ'সিন" বলা হয়। আর "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, কথাবার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহ'সান" বলা হয়।
হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আ. প্রশ্ন করে ছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সা. বলে ছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমন ভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন" উল্লেখ্য..

- ঈমানকে সুন্দর করতে হলে শুধুমাত্র যথাযত দলী তথা ক্বাত্বয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে-ই নিজের ঈমান ও আক্বীদায় স্থান দিতে হবে। উল্লেখ্য আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির হাদীছকে বলা হয় ক্বাত্বয়ী (অকাট্য) দলীল। এ দুই প্রকার দলীল ছাড়া অন্য কোনো প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় আমাদের ঈমান আক্বীদাহর অংশ হবে না। এ ব্যাপারে সকল ঈমানগণ ও ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
- নিজের ইসলামকে সুন্দর করতে হলে হানীফ পদ্ধতিতে ইসলাম মেনে চলতে হবে এবং সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত থেকে দলীল ভিত্তিক কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দর্শন আদর্শ মতবাদ ও নীতিমালা বর্জন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র ইসলাম ও ইসলামী বিধান মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে ইস্লাম্মেনে চলা।
- আদব আখলাক সুন্দর করতে হলে সভ্য ও ভদ্র হতে হবে
- স্বভাব চরিত্র সুন্দর করতে হলে সকল প্রকার পাপাচার ও বদ-স্বভাব পরিহার করতে হবে
- কথাবার্তা সুন্দর করতে হলে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে।

পরিভাষাঃ ১৯. হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানা ভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..
অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসব-ই হাওয়ার অনুকরণ।

- অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।

- এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। (হাওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, সূরাহ আ'রাফঃ ১৭৬, সূরাহ জাছিয়াহঃ ২৩)

পরিভাষাঃ ২০. কুরআন বিমুখ জীবনঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা করা হবে এবং তাদেরকে আরো নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজের শুধু অমুসলিমরা-ই নয় বরং মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানা ভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যে সব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও রীতিনীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা হল বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগত ভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব। আল-কুরআন শিক্ষা দেয় আল্লাহ-ই সকল ক্ষমতার উৎস আর গণতন্ত্রের শিক্ষা হল জনগণ-ই সকল ক্ষমতার উৎস। ইত্যাদি।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম আদর্শগত ভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সূদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি-ই সূদ। (কুরআন বিমুখ জীবন সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ যুখরুফঃ ৪৪)
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছেন তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত আছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ'র সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাত মুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও।

পরিভাষাঃ ২১. বাপ-দাদার দোহাইঃ আল্লাহর দ্বীন প্রত্যাখ্যান করার অপকৌশলঃ আল্লাহর দ্বীন তথা আল-কুরআনের বিধান এবং নবী-রাসূলের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করার এক বিরাট অপকৌশল হল বাপ-দাদাই দোহাই দেওয়া। এটা সকল যুগের কাফির নেতার চিরাচরিত ইউনিক অপকৌশল। আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এ অপকৌশলটি ব্যবহার করে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে থাকে এবং আম জনতাকে দূরে রাখে। যেমন..

- বাপ-দাদা যা করেছেন আমরা তাই করব (সাধারণত গ্রাম্য লোকজন এমন কথা বলে থাকেন)
- এটা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের আংশ (সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতাগণ এমন কথা বলে থাকেন)
- আমাদের আকাবিরদের এমন করতে দেখেছি তাই আমরাও করছি (সাধারণত আলিম উলামাগণ এমন কথা বলে থাকেন)
- এটা-ই আমাদের তরিকা বা সিলসিলা (সাধারণত পীর ও পীরের মুরিদগণ এমন কথা বলে থাকেন)
- এভাবে আরো নানা জনে নানা ভাবে বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যান এবং অন্যকেও বিচ্যুত করেন।

পরিভাষাঃ ২২. বিনোদনঃ পবিত্র কুরআনে সূরাহ লুক্বমানের ৬ষ্ঠ আয়াতে বিনোদন নীতিমালার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিচ্ছা কাহিনী, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গান, চলচ্চিত্র, ইত্যাদি বিনোদন মূলক যেসব প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান বানানো হয়..

- এর ভিত্তি যেন মিথ্যার উপর না হয় বরং সত্যের উপর হয়।
- এসব যেন হাসি তামাশার জন্য না হয় বরং শিক্ষা মূলক হয়।
- এর দ্বারা যেন মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা না হয় বরং আল্লাহর পথে আহ্বান করা হয় বা উৎসাহ দেয়া হত।

পরিভাষাঃ ২৩. ইস্তিওয়াঃ /আল্লাহ্ কোথায়ঃ ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া, বসা, আসন গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে আল্লাহ কিভাবে আরশে ইস্তিওয়া করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আসলে আল্লাহ কথায়? এব্যাপারে জানতে হলে নিম্নের আয়াতসমূহ বুঝতে হবে।

- সূরাহ ত্বাহার ৫ম আয়াতে বলা হয়েছেঃ রাহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।
- সূরাহ রা'দের ২য় আয়াতেও বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে।
- সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিকটে।
- সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরো নিকটে।
- সূরাহ ক্বাহাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহ রগের চেয়ে নিকটে।
- সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে।
- সূরাহ ফুসসিলাতের ১১তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আকাশে।

আসলে আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমান ভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওহীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহ রগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানে-ই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে। সমান ভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আকাশে, আল্লাহ্ আরশে। এবং এব্যাপারে মনগড়া বা মানুষের ধারণাভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

পরিভাষাঃ ২৪. ছামূদ জাতি ও স্বালিহ আঃ = বর্তমান সৌদি আরবের মদীনাহ ও তাবূকের মাঝে একটি জায়গার নাম হিজর, জায়গাটি মাদাইন স্বালিহ বা স্বালিহ নগরী নামেও পরিচিত। এক সময় এখানে গড়ে উঠেছিল বিরাট মানব সমাজ। ইতিহাসে তারা ছামূদ জাতি হিসেবে পরিচিত। ছামূদ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে মনগড়া পথ ধরে যখন কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠল তখনি আল্লাহ তাদেরকাছে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন তাদেরি এক ব্যক্তি স্বালিহ আঃকে। স্বালিহ আঃ'র বংশ পরিচয় এভাবে পাওয়া যায়। তিনি হলেন স্বালিহ বিন আ'দ্দ বিন মাসিহ' বিন উ'বাইদ বিন হা'জির বিন ছামূদ বিন আ'বির বিন ইরাম বিন সাম বিন নূহ আঃ।

পরিভাষাঃ ২৫. আ'দ জাতি ও হূদ আ. = নূহ আঃর সময়ের মহাপ্লাবনের পর নূহ আঃ'র বংশধরগণ চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এর মধ্যে ইয়ামান ও উমানের মধ্যবর্তি আহক্বাফ নামক স্থানে গড়া উঠল এক বিরাট মানব সমাজ। জাতি হিসেবে তারা আ'দ নামে পরিচিত। আ'দ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠলে আল্লাহ হূদ আঃকে তাদের রাসূল বানিয়ে পাঠালেন। তিনি হলেন হূদ বিন শালিখ বিন আরফাশায বিন সাম বিন নূহ।

পরিভাষাঃ ২৬. নূহ আ. = দুনিয়ার প্রথম মানব সমাজ গড়ে উঠেছিল শামদেশে। আদম আঃ ছিলেন এ সমাজের নেতা। এ সমাজের মূলভিত্তি ছিল তাওহীদ আর আইনের উৎস ছিল ইসলামী শারীয়া'হ। আদম আঃ মারা যাবার পর তাঁর ছেলে হিবাতুল্লাহ সমাজের হাল ধরেন। মহান আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি শীশ আঃ নামে পরিচিত। শীশ আঃর পর মানব সমাজে বিচ্যুতি শুরু হয়। ওহীর জ্ঞান শূন্য লোকেরা সমাজের নেতা হয়। শুরু হয় মনগড়া পথে জীবন যাপন। শয়তানের প্ররোচনায় নেক লোকদের প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য বানিয়ে স্থানে স্থানে স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রজন্মের মানুষ স্মৃতি চারনের জন্য এসব ভাস্কর্যের কাছে এলেও পরে শুরু হয় শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা এবং এক পর্যায়ে পূজা ও উপাসনা। এভাবেই "প্রতিকৃতি থেকে মুর্তি আর মুর্তি থেকে দেবদেবী"র সূত্র ধরে মানব সমাজে শিরকের সূচনা হয়। পুরা সমাজটা শিরকে ভরে উঠলে মহান আল্লাহ সদয় হয়ে নূহ আঃকে পাঠালেন।

পরিভাষাঃ ২৭. মাদইয়ান, আইকাহ ও শুয়া'ইব আ. বৃহত্তর শাম এবং বর্তমান জর্দানের একটি এলাকা মাদইয়ান। মাইইয়ানে গড়ে উঠেছিল বিরাট মানব সমাজ। মাদইয়ান বাসী কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠে ছিল। মাদইয়ান বাসীর পেশা ছিল ব্যবসা। ব্যবসার নামে তারা গ্রাহকদের সাথে ধোঁকাবাজি প্রতারণা করত। তারা অন্যদের থেকে কোনোকিছু ক্রয়ের বেলায় বেশী আনত আর মানুষকে দেবার বেলায় কম দিত। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হয়ে শুয়া'ইব আঃকে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন। আইকাহবাসীর কাছেও শুয়া'ইব আঃকে পাঠানো হয়েছিল। কোনো কোনো মুফাসসিরীনের মতে মাদইয়ান ও আইকাহ বলে এক-ই জাতিকে বুঝানো হয়েছে। মাদইয়ান জাতির নাম আর আইকাহ এলাকার নাম। আর কারো মতে আইকাহ ও মাদইয়ান দুই জাতি। শুয়া'ইব আঃ দুই জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল ছিলেন। (সঠিক ব্যাপার আল্লাহই জানেন।) তিনি হচ্ছেন শুয়া'ইব বিন নুয়াইব বিন ই'ফা বিন মাদইয়ান। তিনি ছিলেন ইবরাহীম খালিলূল্লাহর বংশধর। তাদের বর্ননায় নাযিল হয়েছেঃ

পরিভাষাঃ ২৮. লূত্ব আ. ও মৃত সাগরঃ = লূত্ব আ. যে এলাকার রাসূল ছিলেন এ এলাকাটি বর্তমান জর্ডানে অবস্থিত। লূত্ব আ. মূলত ইরাকের বাসিন্দা ছিলেন। ইবরাহীম আঃ'র সাথে হিজরত করে তিনি ইরাক থেকে শাম এসেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ সদয় হয়ে তাকে ওই এলাকার রাসূল হিসেবে নিযুক্ত করে ছিলেন। লূত্ব আঃর জাতি সমকামী ছিল। তাদের পুরা এলাকাটি আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে সাগরে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ যাকে মৃত সাগর হিসেবে চিনে। মৃত সাগরে প্রাণীর কোনো অস্থিত্ব নেই। কোনো প্রকার জলজ প্রাণী ছাড়লেও মরে যায়। মৃত সাগরে মানুষজন ডুবে না। সাগরে ঝাপ দিলে মানুষ চিত হয়ে ভেসে থাকে। (কেউ চাইলে গোগলে গিয়ে মৃত সাগর /ডেড সী লিখে সার্চ করলে মৃত সাগরের ভিডিও ব ফটো দেখতে পারবেন)

পরিভাষাঃ ২৯. সমন্বয়ঃ সূরাহ বাক্বারাহর ২৭তম আয়াতে দ্বীন ও সুনিয়ার সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ মত সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে আর যে যারা এসব বিষয়কে আলাদা করে ফেলবে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার দ্বীন ও দুনিয়া তথা ইবাদাত, সমাজ, ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, পেশা, দক্ষতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মানুষের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ে কুরআন হাদীছের সমন্বয় ঘটাবে তথা ইসলামী বিধান মেনে চলবে। কোনো ব্যাপারে ইসলাম আর কোনো ব্যাপারে অন্যকিছু মেনে নিলে বা মেনে চললে সমন্বয় হীনতা তৈরি হয়। ইসলামী সমাজনীতির পরিভাষায় একে বলা হয় বিচ্ছিন্নতা তথা দ্বীন ও দুনিয়াকে আলাদা করে ফেলা। এমন করা কুফর, ঈমান বিনষ্ট কারী মহাপাপ। এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়।

পরিভাষাঃ ৩০. আ'যীমাত ও রুখসাত পরিচিতিঃ বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মানতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারনে কখনো কখনো দ্বীনি বিধান পালন করা কঠিন হয়ে যায়। তখন আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগী, বোঝে উঠতে পারি না কি করব, কোন পথে যাব?

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। সকল যোগের সকল স্থানের সকল মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মুলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। মানুষের এমন অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলামী বিধান পালনের জন্য দুটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়া'হ। অর্থাৎ ইসলামী বিধান পালনের পদ্ধতি দুইটিঃ আ'যীমাত ও রুখসাত। এবার আসুন! আ'যীমাত ও রুখসাত সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

আ'যীমাতঃ আ'যীমাত অর্থ দৃঢ় থাকা, অবিচল থাকা। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকার নাম আ'যীমাত।
রুখসাতঃ রুখসাত অর্থ অনুমোদন, সুযোগ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে জীবন বাঁচানোর সুযোগ গ্রহণ করার নাম রুখসাত।

বিধানঃ ইসলামী বিধানে আ'যীমাত ও রুখসাত দুই পদ্ধতিই অনুমোদিত। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান বা ইসলামী বিধানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকা মোটেই নির্বুদ্ধিতা বা নিন্দনীয় নয়। বরং ইহা ইসলামের আ'যীমাত পদ্ধতি।
আ'যীমাতের উপর অবিচল থাকলে প্রতিদান পাওয়া যায়। এপথে কষ্ট সহ্য করলে মহান আল্লাহ উপযুক্ত বিনিময় দেন, বরং আরো বাড়িয়ে দেন। এ অবস্থায় মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। শহীদকে ৫টি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।
পক্ষান্তরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে (অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে) শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিলেও পাপ হয় না বা ঈমানের ক্ষতি হয় না। ইহা হচ্ছে ইসলামী বিধানের রুখসাত পদ্ধতি। রুখসাত পদ্ধতিও ইসলামে অনুমোদিত এবং এর মান মর্যাদাও কম নয়। (এ সম্পর্কে জানতে দেখুন নাহাল ১০৬)

পরিভাষাঃ ৩১. রাব্বঃ যিনি মালিক, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, বৈধ-অবৈধ নির্নয় করেন তথা জীবন বিধান ঠিক করে দেন, তিনিই রাব্ব। রাব্ব অর্থ প্রভূ, মালিক, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, ইত্যাদি। আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা বা নীতি নির্ধারক হিসেবে মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে তথা প্রভূত্বে শিরক হয়। জাতি ও সমাজের প্রয়োজনে কোনো আইন প্রণয়ন করার একান্ত প্রয়োজন হলে মানুষ এটা করতে পারবে তবে এটা হতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কোনো আইন তৈরি করা অবৈধ কাজ এবং এমন আইন ও হবে অবৈধ আইন। মোদ্দা কথা আইন তৈরিতে মানুষ স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। রবং আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে-ই মানুষকে আইন তৈরি করতে হবে। এটাই রুবুবিয়্যাতের দাবী। আর আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ মেনে চলা-ই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। রুহ জগতে আল্লাহর আমাদের থেকে যে ওয়াদা নিয়েছেন এটা ছিল রাব্ব সম্পর্কে আর মরনের পর সর্বপ্রথম আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটাও হবে রাব্ব সম্পর্কে। তাই সাবধান! বন্দূগণ সাবধান!!

পরিভাষাঃ ৩২. ইলাহঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীন ভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পূন্যের পুরস্কার দেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন, যার মালিকানা হয় সার্বভৌম আর ক্ষমতা হয় নিরঙ্কুশ, যিন সকল কিছুর উৎস, তিনি-ই ইলাহ। আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

পরিভাষাঃ ৩৩. তাওয়াক্কুলঃ তাওয়াক্কুল অর্থ ভরসা করা। যথাসাধ্য কাজ এবং সাধ্যমত চেষ্টা করার পর ফল পাবার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।

পরিভাষাঃ ৩৪. তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করণ, শুদ্ধি করণ, পরিচ্ছন্ন করণ, ইত্যাদি। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরক মুক্ত করা"। আর তাফসীর ক্বরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে.. অন্তর দিয়ে ঈমান আনা /অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপ মুক্ত করা /সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর প্রকারভেদঃ তাযকিয়্যাহ আসলে ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

ঈমানের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের ঈমান তথা আক্বীদাহ বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলঃ দালীল ক্বাত্বয়ী' তথা শুধু আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহকে ঈমান ও আক্বীদাহ অংশ হিসেবে বিশ্বাস করা।

আমলের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের কর্ম ও জীবনকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলঃ বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া কোনো বিষয়কে আমলে পরিণত না করা। উল্লেখিত উভয় প্রকার তাযকিয়্যাহ করার জন্য-ই নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ জুমুয়া'হ এর ২য় আয়াতে।

ক্বলবের বা আত্মার তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের আত্মা বা অন্তরকে বিশুদ্ধ করা ও বিশুদ্ধ রাখা। মানুষের ক্বলব তথা মানব আত্মা বা মানব অন্তর যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তাই কোনো মানুষ এটাকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ৪৯ তম আয়াতে।

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ আল-কুরআন অধ্যায়ন করে, আল-কুরআনের অনুশীলনী করে, আল-কুরআনের নীতিমালা মেনে মানব আত্মাকে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা এবং মুক্ত রাখাই তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি।

একটি ভূলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ড তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসাবে কাজ করা। (বাকারাহঃ ১৫১)

পরিভাষাঃ ৩৫. জিহাদ, ক্বিতাল ও যুদ্ধঃ
একটি ভূলের অবসানঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক মানুষকেও বলতে শোনা যায়ঃ "ইসলাম হল শান্তির ধর্ম, এখানে যুদ্ধের কথা থাকবে কেন"? এরা মনে করে আসলে-ই ইসলামে যুদ্ধের কথা নেই বা যুদ্ধের কথা থাকা উচিত নয়।

তাই যেসব মুসলিম জিহাদের কথা বলে বা যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে চায় অথবা যুদ্ধকে সমর্থন করে; এরা তাদেরকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ, ইত্যাদি নানা মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রপাগান্ডা করে থাকে। এর মূল কারণ হলঃ এরা বুঝেই উঠতে পারে না "ইসলাম কেন যুদ্ধের কথা বলবে"?
আর এ বিষয়টি না বুঝার অন্যতম কারণ হলঃ এরা ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম মনে করে এবং ধর্ম হিসেবেই মানে। আসলে ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয় বরং ইসলাম হল একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ; এ সহজ কথাটি এরা বুঝে না বা মেনে নিতে পারে না।
তবে প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষানীতি বা যুদ্ধনীতি থাকতে হয়। যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ জাতি বা সরকার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ কথা সবাই বুঝে এবং মেনেও নেয়।
আসল ব্যাপার হলঃ ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। বরং ইসলাম হল পরিপূর্ণ একটি জীবন আদর্শ। দেশ ও জাতি গঠন, ন্যায় সাম্য অধিকার ও আইনের শাসন, সরকার গঠন ও পরিচালনা, ইত্যাদি হল ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং ইসলামের নিজস্ব প্রতিরক্ষানীতি ও যুদ্ধনীতি অবশ্যই থাকতে হবে এবং আছেও।
ইসলাম তার জাতির জন্য যে যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে এরই নাম "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। আর আল্লাহ প্রদত্ব এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। তাই এটাকে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" বা আল্লাহর পথে জিহাদ বলা হয়।

পরিভাষাঃ ৩৬. সমাজ ও জাতিঃ ইসলাম শুধু গতানুগতিক ধর্ম নয়। ইসলাম বিশ্বাব্যাপী একটি ইউনিক সমাজ ও মুসলিম জাতি গঠনের তাগিদ ও ফর্মুলা দিয়েছে এবং এই সমাজ ও জাতি গঠন করে ইসলামকে সামাজিক ও জাতীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়ে ছিলেন আল্লাহর রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ। প্রতিটি জাতির মত ইসলামেরও রয়েছে নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতি। ইসলামী প্রতিরক্ষা নীতির নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

পরিভাষাঃ ৩৭. হারামঃ ইসলামী বিধান মতে আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ কাজ বা বস্তুকে হারাম বলা হয়। ফিক্বহী বিধান মতে কোনোকিছু হারাম হতে হলে ক্বাত্বয়ী' দলীল তথা আল-কুরআনের সুস্পষ্ট মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছের প্রয়োজন হয়। অস্পষ্ট আয়াত বা সাহদারন সাহীহ হাদীছ দ্বারা হারাম প্রমান করা যায় না। বরং এতে মাকরুহ বা সাধারন ভাবে অপছন্দনীয় প্রমানিত হয়।
উল্লেখ্য আমাদের বর্তমান সমাজে সাধারনত হারাম দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মানসূস হারাম ও মুজতাহাদ হারাম।
মানসূস হারামঃ যে হারামের কথা আল-কুরআন বা সাহীহ হাদীছে স্পষ্ট ভাবে বর্নিত হয়ে ইহা মানসূস হারাম। যেমনঃ মৃত, শূকরের মাংস বা প্রবাহমান রক্ত হারাম হওয়া। মানসূস হারামকে হালাল মনে করা বা মানসূস হালালকে হারাম মনে করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

মুজতাহাদ হারামঃ যে হারাম আল-কুরআন বা সাহীহ হাদীছে বর্নিত হয়নি। মুজতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয় বরং ফিক্বহী নিয়মের আওতায় পড়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমনঃ কচ্ছপ খাওয়া, ডলফিন খাওয়া, কাকড়া খাওয়া, ইত্যাদি। এসব বিষয় আসলে হারাম নয় বরং কোনো ইমামের মতে মাকরুহ। তবে আজকাল অনেক আলীম সীমাহীন বাড়াবাড়ি ও মাত্রাতিরিক্ত অতিরঞ্জিত করে এসবকে হারাম বলে ফেলেন। এসব ব্যাপারে ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক। কোনো সূত্র মতে এসব হারাম হবে আর কোনো সূত্র মতে হালাল। এসব ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য এবং এতে পাপ হয় না।

পরিভাষাঃ ৩৮. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধঃ আদেশদাতা পূর্ন কর্তৃত্ব সহকারে কাউকে কিছু করতে বললে এটাকে আদেশ বলা হয়। আর আদেশদাতার কর্তৃত্ব না থাকলে এটাকে বলা হয় অনুরোধ, আবেদন বা আহবান। আর নেতিবাচক আদেশকে বলা হয় নিষেধ। সমাজে আদেশ নিষেধের এমন ব্যবস্থা চালু রাখা ইসলামী সরকার ও সমাজপতিদের নৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।
ইসলামী সরকার বা সমাজপতিদের দায়িত্ব হল সমাজে এমন একদল মানুষকে নিয়োগ দেয়া যারা হবে ইসলামী বিধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন। সমাজ ও সরকারের পক্ষ থেকে উনাদেরকে বিচারিক ক্ষমতাও দেয়া হবে। উনারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। ইসলাম সরকার ও সমাজের উপর ইহা একটি ফরজ দায়িত্ব।

পরিভাষাঃ ৩৯. হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানবরচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানা ভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে।
- অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। হাওয়ার অনুকরণ করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

যে বা যারা মনগড়া পথে চলে তাদের অন্তরে ও কানে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের চোখে এটে দেওয়া হয় পর্দা তথা তাদের সবকিছুকে লক করে দেওয়া হয়। সুতরাং পুনরায় অনলক করতে হলে মনগড়া সকল পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে চলতে হবে।

মানবরচিত মনগড়া ও ধারনা ভিত্তিক আইনঃ যে যা তৈরি করে এটা পরিচালনার নিয়ম নীতি তৈরি করার অধিকার ও তার। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, মালিক। তাই আমাদের আইন ও বিধান তৈরির একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ। আমাদের জন্য আইন ও বিধান তৈরির মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়া'লা। এসব মূলনীতির উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। তাই কুরআন সুন্নাহর মূলনীতির বাহিরে যে আইন বা বিধান তৈরি করা হয় ইহা ভিত্তিহীন ও মনগড়া। কিছু মানুষের কল্পনা, ধারনা ও চিন্তার ফসল। আর এই ধারনা ভিত্তিক আইন ও বিধানই চলে আসছে বিশ্বময়।

পরিভাষাঃ ৪০. যিকর পরিচিতঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। পবিত্র কুরআনের অনেক জাগায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বোঝানো হয়েছে, অনেক জাগায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। মোট কথা যিকর শব্দটি পবিত্র কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন বিধান, উপদেশ, ইত্যাদি কল্যাণকর অনেক অর্থে।
কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বোঝিয়ে থাকেনঃ পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

পরিভাষাঃ ৪১. সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে নাঃ ইসলাম আল্লাহর দ্বীন, ইসলামী বিধান আল্লাহর বিধান। ইসলামই একমাত্র আদর্শ যা মানুষের সুবিধা অসুবিধার প্রতি নিপুণ ভাবে লক্ষ্য রাখে। ব্যক্তির সুবিধার বা অসুবিধার জন্য আইন ও বিধানকে বদলে দিয়ে বা শিথীল করে মানুষকে সুবিধা দেয় ইসলাম। ইসলামী বিধানের যে কয়টি মূল সূত্র রয়েছে এর একটি হলঃ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না। নামায রোজা হাজ্ব যাকাতসহ প্রতিটি ইবাদাতেই এ সুত্র দেখে ফতোয়া দিতে হবে।

পরিভাষাঃ ৪২. মুহকাম ও মুতাশাবিহঃ মানার ব্যাপারে আল-ক্বুরআনের আয়াত সমূহ দুই ধরণের হয়ে থাকে তথা মুহকাম ও মুতাশাবিহ। ইরশাদ হচ্ছে..
আল্লাহ নাযিল করেছেন কিতাব। এর কিছু আয়াত মুহকাম এবং এগুলো-ই কিতাবের মূল আর কিছু মুতাশাবিহ। যাদের অন্তর রুগ্ন তারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে ফিতনাহ করার জন্য অথবা মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য। আসলে এসবের মর্ম কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। জ্ঞানী লোকেরা বলেঃ “আমরা সব মেনে নিয়েছি, সবই প্রভুর পক্ষ থেকে” আর গ্রহণ করে জ্ঞানী লোকেরাই। (আল-ই'মরানঃ ৭)

মুহকাম পরিচিতিঃ বিধান সম্বলিত সুস্পষ্ট আয়াতকে মুহকাম বলা হয়। মুহকাম আয়াত সমূহই আল-ক্বুরআনের মূল। মুহকাম আয়াত বিধান ও আইন সম্পর্কিত।

মুতাশাবিহ পরিচিতিঃ আল-ক্বুরআনে কিছু আয়াত আছে একাধিক অর্থ সম্বলিত। এসব আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন খুবই কঠিন। কারণ মহান আল্লাহ এসবের মর্ম কাউকে বাতলে দেননি। বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী এসব আয়াতকে মুতাশাবিহ বলা হয়।

পরিভাষাঃ ৪৩. নাসিখ ও মানসুখঃ আল-ক্বুরআনের বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহের মাঝে কিছু আয়াত হল নাসিখ আর কিছু মানসুখ। নাসিখ আয়াতে আমল করতে হয় আর মানসুখ আয়াতে আমল করতে হয় না। তাই আল-কুরআন মেনে চলতে হলে নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক কথাঃ ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। অসহায় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হয়েছিল ইসলাম। দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ হওয়া ইসলামী বিধানে সঙ্গত কারণেই মাঝে মাঝে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এমন পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে বলা হয় নাসিখ ও মানসুখ।
নাসিখ পরিচিতিঃ যে আয়াত দিয়ে অন্য আয়াতের বিধান রহিত করা হয়েছে এটাকে নাসিখ বলা হয়।
মানসুখ পরিচিতিঃ যে আয়াতের বিধান রহিত করে নতুন বিধান দেয়া হয়েছে এটাকে মানসুখ বলা হয়। মানসুখ তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথা..
ক. আয়াত বাকি বিধান মানসুখ। যেমনঃ সূরাহ বাকারার ১৮৪তম আয়াতের একটি বিধান হল সামর্থবান ব্যক্তিরা রামাদ্বানে রোজা রাখবে অথবা ফিদয়া দিবে। অর্থাৎ রামাদ্বানে রোজা তাথা আবশ্যক ছিল না। রোজা না রেখে ফিদয়া দিলেও হয়ে যেত। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত করে ১৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছে সবাইকে রোজা রাখতে হবে।
খ. বিধান বাকি শুধু আয়াত মানসুখ। যেমনঃ রাজম সম্পর্কিত আয়াত। উমার বিন খাত্তাব রাঃ থেকে বুখারী ও মুসলিমের দীর্ঘ এক হাদিছে যা বর্ণিত হয়েছে।

পরিভাষাঃ ৪৪. তাহরীফঃ তাহরীফ অর্থ পরিবর্তন। আল্লাহর কালামের শব্দ, অর্থ, মর্ম বা বিধান বদলে ফেলাকে তাহরীফ বলা হয়। ইয়াহুদরা প্রথম তাহরীফ শুরু করে।

পরিভাষাঃ ৪৫. ইখতিলাফ বা ভিন্নমতঃ ইসলামী শারীয়া'হর যেসব বিধান বা বিষয় অকাট্ট দলীল (কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত এসব মেনে নেয়া ফরজ এবং অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর, এসব বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের কোনো সুযোগ নেই। আর যেসব বিধান ইজতিহাদ দ্বারা বা অস্পষ্ট আয়াত (যার একাধিক অর্থ রয়েছে) দ্বারা বা সাধারন সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত এতে ভিন্ন মত হতে পারে এবং দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ রয়েছে। তাই দলীল ভিত্তিক এসব মতের যে কোনো একটি বা একাধিক মত মেনে নেয়া যেতে পারে। তবে বাস্তব অনুশীলনীর জন্য একটি অভিমত মেনে নিলেও নীতিগত ভাবে দলীল ভিত্তিক অন্য সকল

মতামত মেনে নিতে হবে। এসব মতের কোনোটিকে নীতিগত ভাবে অমান্য করা বা বিভ্রান্ত বলা যাবে না। এমন করলে এই ভিন্নমতকে ভিন্ন পথে রূপান্তরিত করা হবে। আর ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও ভিন্ন পথ বানানো নিষিদ্ধ এবং বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ।

পরিভাষাঃ ৪৬. কুফরঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সে মতে আল্লাহর কোনো বিধান অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা, অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি হল কুফর, আল্লাহর কোনো বিধান বা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য নিয়ে উপহাস করা এবং যাদু করাও কুফর। রাসূল সা.কে গালি দেওয়া, রাসূলকে অসম্মান করা অথবা রাসূলের আদেশের অবাধ্য হয়াও কুফরের শামিল। কোনো মুসলিম যদি কুফর করে তবে তাঁর ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) সেমতে..

- আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বাঁধার সৃষ্টি করা;
- আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- আল্লাহর দেয়া তথ্য গোপন করা; তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

পরিভাষাঃ ৪৭. শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। মহান আল্লাহ তার জাতিসত্বা এবং যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে এক ও অদ্বিতীয়; এটা হল তাওহীদ। আর তাওহীদের বিপরীত হল শিরক। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাতিসত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা অংশীদার বানানো হল শিরক। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে, পরিবার আছে বা সাহায্যকারী আছে বলে বিশ্বাস করা। এসব হল আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক
- আল্লাহ ছাড়া অন্যকাউকে সার্বভৌমত্বের মালিক, ক্ষমতার উৎস বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। এসব হল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যকাউকে বা অন্যকিছুকে সম্মান জানাতে গিয়ে এমন কিছু করা। এটা হল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে নীতিনির্ধারক বা কর্তৃত্বশীল মনে করা। এটা হল আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া। এটা হল আল্লাহর বুরুবিয়্যাতে শিরক। ইত্যাদি, ইত্যাদি..।
- উল্লেখিত কাজসমূহ বড় শিরক। এমন শিরকে জড়ালে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। এবং কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক
- আর আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে কসম করা। অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্যের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদাত করা। ইত্যাদি হল ছোট শিরক।

পরিভাষাঃ ৪৮. কুফর ও শিরক একই ধরনের পাপঃ সূরাহ আল-ই'মরানের ১৫১ তমায়াতে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেবেন, কারণ তারা শিরক করেছে"। এতে বুঝা যায় কুফর ও শিরক দুটি স্বতন্ত্র পাপ হলেও কখনো কখনো পাপ দুটি একীভূত হয়ে যায়। যদিও একাডেমিক ভাবে কুফর তুলনামূলক ভাবে শিরক থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানে সকল মুশরিকই কাফির হয় তবে সকল কাফির মুশরিক হয় না। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলে তবে "হুদূদ" মানে না। তার এ পাপকে কুফর বলা যাবে তবে শিরক নয়।

পরিভাষাঃ ৪৯. আল-কুরআন জ্ঞানের উৎসঃ হেদায়াতের একমাত্র উৎস আল্লাহর কিতাব। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলবে সে-ই হেদায়াত পাবে আর যে মানবে না সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর কিতাবই আমাদের আইন ও জ্ঞানের একমাত্র সঠিক উৎস। তবে হাঁ..,

- কোনো বিষয়ে সমাধান আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া গেলে দেখতে হবে সুন্নাহ বা হাদীছ
- আর হাদীছে না পাওয়া গেলে সাহাবাদের উক্তি
- এবং তাতেও না পাওয়া গেলে শর্ত সাপেক্ষে ইজমা ও কিয়াস।
- এটা-ই ফিক্বহী নিয়ম এবং এটাই ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মাযহাবের মূল কথা।

পরিভাষাঃ ৫০. আনুগত্য পরিচিতিঃ শারীয়া'হ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। কারো বৈধ আদেশ বা নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। সুতরাং আল্লাহর সকল আদেশই বৈধ এবং সকল আদেশই মেনে চলতে হবে।
- রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪) তাই আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে হলে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।
- আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

পরিভাষাঃ ৫১. অনুকরণ পরিচিতিঃ কোনো ব্যক্তি, সমাজ, কিতাব বা নীতিকে হুবহু মেনে চলার নাম অনুকরণ। সাধারণত মানুষ তার বাস্তব জীবনে চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর এ চারটি বিষয় হল..

- আদর্শের অনুকরণ
- ব্যক্তির অনুকরণ
- কিতাব বা বিধানের অনুকরণ
- সমাজের অনুকরণ।

আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু তা-ই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে আমরাও উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব। যেমন..

- অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃর আদর্শ তথা তাওহীদ ও শিরক মুক্ত থাকার আদর্শ। এ আদর্শের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে শিরক হয়। (দেখুন সূরাহ হাজ্জ ২২/৭৮)
- ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃর বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ৩/৩১)
- কিতাব বা বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এর বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নিলে কুফর ও শিরক হবে। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ৬/১০৬)
- সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এ সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২/১৩৭)

পরিভাষাঃ ৫২. নূর পরিচিতিঃ নূর অর্থ আলো। দুনিয়ার অন্ধকারে মানুষ আলোর সাহায্যে পথ চলে। আর কুফরের অন্ধকারে মানুষকে আলোর পথ দেখাতে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন নবী রাসূল, কিতাব ও দ্বীন। তাই আল-কুরআনে এই সবকিছুকেই নূর বলা হয়েছে। যেমনঃ

- সূরাহ নিসার ১৭৪ তম আয়াতে আল-কুরআনকে নূর বলা হয়েছে
- সূরাহ মাইদাহর ১৫ তম আয়াতে নবী সাঃর প্রতি ইঙ্গিত করে নূর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে
- সূরাহ তাওবাহর ৩২তম আয়াতে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ইঙ্গিত করে নূর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে
- সূরাহ নূরের ৩৫ তম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়া'লাকে নূর বলা হয়েছে
- সূরাহ বাক্বারাহর ২৫৭ তম আয়াতে ঈমান ও ইসলামের প্রতি ইঙ্গিত করে নূর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিভাষাঃ ৫৩. আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করাঃ সূরাহ নিসার ১৫০ আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরির কথা বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক জনে অনেকভাবে কাজটি করে থাকেন। যেমন..

- আমাদের সমাজের অনেকেই দ্বাইফ বা মাওদ্বু' হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ান। অথচ হাদীছ কখনো কুরআনের বিপরীতে দলীল হিসেবে গণ্য হয় না।
- অনেকে আবার ইমামের মতামত বা ইজতিহাদকে হাদীছের বিপরীতে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। অথচ কোনো ইমামের উক্তি বা ইজতিহাদ কখনো সাহীহ হাদীছের বিপরীতে দলীল হতে পারে না। ইহাই সকল ইমামের ঐক্যবদ্ধ উক্তি।
- না বুঝে বা পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেকে আবার মাযহাবকে কুরআন বা হাদীছের বিপরীতে এনে হাজির করেন। অথচ মাযহাব কখনো কুরআন বা সুন্নাহর বিপরীতে দাড়াতে পারে না। বরং কুরআন এবং সুন্নাহর আনুগত্য ও কনুকরণই মাযহাবের মূল কথা।

ফিক্বহ তথা কুরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াসঃ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস; এগুলো হচ্ছে ফিক্বহের দলীল। ফিক্বহের দলীল ৪টি হলের এ ৪টির মান আবার সমান নয়। কিন্তু আজকাল পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেকেই এসন বুঝে না। আর না বুঝে নিজেও বিভ্রান্ত হয় এবং মানুষকেও বিভ্রান্ত করে।

আসলে দুনিয়াতে সর্বদাই বিভ্রান্ত লোকদের ছড়াছড়ি এবং এদের এসব বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আর এসব বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে হলে ঈমান ও ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয়। মনে রাখবে হবে আল-কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল-কুরআনে বর্নিত পথই একমাত্র সঠিক পথ। আর কোনো বিষয় আল-কুরআনে সুস্পষতভাবে পাওয়া না গেলে তখন শর্ত সাপেক্ষে সুন্নাহ বা হাদীছকে দলীল হসেবে মেনে নিতে হয়। আল-কুরআনের পর দুটি শর্তে সুন্নাহ বা হাদীছ মেনে নিতে হয় ও চলতে হয়। যথা..

১. কোনো বিষয় আল-কুরআনে না পাওয়া গেলে তখন সুন্নাহ দেখতে হয়,
২. লক্ষ রাখে হবে সুন্নাহ যেন আল-কুরআনের বিপরীতে না যায়।

সুন্নাহ বা হাদীছের পর প্রয়োজন হলে শর্তসাপেক্ষে ইজমা কিয়াসসহ অন্যকিছু মেনে নেওয়া যায়। তাই ইমামগণের মতামতের উপর সর্বদাই হাদীছ বা সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতে হয়, এব্যাপারে সকল ইমাম-ই একমত। উপমহাদেশের প্রায় সকল কাওমী মাদরাসায় ইফতা ক্লাসে একটা কিতাব পড়ানো হয়,নাম "উক্বুদু রাসমি-ল-মুফতী" ওই কিতাবে লিখা আছেঃ ইমাম আবু-হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী' আহমদসহ উনারা সবাই বলেছেনঃ "আমার মতামতের বিপরীতে যদি কোনো সাহহ হাদিছ পাওয়া যায় তবে আমার মতামত বাদ দিয়ে হাদীছের উপর আমল করতে হবে"

পরিভাষাঃ ৫৪. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারঃ পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। আসলে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে দুটি সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এর মাঝে..
১ম সাক্ষ্য হলঃ "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই" এর সারকথা হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা এবং আল্লাহর বিপরীতে অন্য কিছু না মানার অঙ্গীকার করা। আর..
২য় সাক্ষ্য হলঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল" এর সারকথা হচ্ছে জীবনের সকল কাজে মুহাম্মাদ সাঃকে একমাত্র আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করা।
আর বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীত কিছু করার মানেই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম এবং বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

পরিভাষাঃ ৫৫. আদল, ক্বিসত ও শাহাদাহঃ পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এসব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিষ্ঠা করার পর এগুলোকে ধরে রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা সকল মানুষের মানবিক দায়িত্ব এবং মুলিমদের ঈমানী দায়িত্ব। ন্যায় বিচারের মূল বিষয় আইনের শাসন বজায় রাখা এবং আইনের চুখে সবাইকে সমান ভাবে দেখা, আর ইহাকেই বলা হয় সাম্য বা সমান অধিকার। ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা এবং বজায় রাখা মুসলমানদের ফরজ দায়িত্ব।
আর ন্যায় বিচারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল সাক্ষ্য। তাই সাক্ষ্য দিতে হবে সঠিক ভাবে এবং আল্লাহর জন্য। মিথ্যা সাক্ষ্য ন্যায় বিচারকে বিঘ্নিত করে, তাই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হারাম এবং জঘন্যতম মহাপাপ। রাসূল সাঃ যে ৭টি পাপকে ধ্বংসাত্বক বলে অভিহিত করেছেন এরমধ্যে একটি হল মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

পরিভাষাঃ ৫৬. মুলক বা সার্বভৌমত্বঃ আল-কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর মালিকানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে মালিকানা হচ্ছে দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হল বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- আর যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হল সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

পরিভাষাঃ ৫৭. মুঅমিন ও তার দায়িত্বঃ মুঅমিন হতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হয়
- ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিধান মেনে চলতে হয়।

আর মুঅমিন হবার পর অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর মাঝে ৪টি দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ যথা..

- দ্বীন ও শারীয়া'হ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা
- মৃত্য পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলতে হয়
- ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দিতে হয়
- সমাজে দ্বীন কায়েমের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয় এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়।

পরিভাষাঃ ৫৮. হু'কম পরিচিতিঃ পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর হুকমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হা'কিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরধারক)
- হুকম অর্থ জান ও প্রজ্ঞা। আর এ অর্থে নবিয়তকেও হুকম বলা হয়।

আর এসব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা হুকম শব্দের তরজমা করেছি "বিচার ও শাসন"। যদিও কেউ কেউ তরজমা করেছেন বিচার ও ফয়সালা।

পরিভাষাঃ ৫৯. শাফায়াত পরিচিতিঃ শাফায়া'ত অর্থ সুপারিশ করা। হাশরের ময়দানে বিচারের পর আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পাপিষ্ঠদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। এই সুপারিশকে বলা হয় শাফায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় শাফায়া'ত। পরকালে কোনো নাস্তিক, মুরতাদ, কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকের জন্য শাফায়া'তের সুযোগ থাকবে না। শাফায়া'তের সুযোগ থাকবে শুধু ফাসিকদের জন্য।
উল্লেখ্য মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। পরকালে শুধু মুঅমিন ব্যক্তিকে শাফায়া'তের সুযোগ বা অনুমতি দেয়া হবে এবং এই শাফায়া'ত হবে নির্ধারিত নিয়মে..

- শাফায়া'ত শুধু মুঅমিন ব্যক্তিই করতে পারবে, মুঅমিন ব্যতীত অন্য কেউ শাফায়া'ত করতে পারবে না।
- যে মুঅমিন শাফায়া'ত করতে আগ্রহী হবে তাকে প্রথমে শাফায়া'তের অনুমতি নিতে হবে,
- তারপর যার জন্য শাফায়া'ত করতে চায় তার নাম উল্লেখ করে আবার অনুমতি নিতে হবে।
- আল্লাহ অনুমতি দিলে শাফায়া'ত করতে পারবে আর না দিলে পারবে না।
- এরপর আল্লাহ চাইলে এই শাফায়া'ত গ্রহণ করবেন, অথবা করবেন না।
- শাফায়াত গ্রহণ করা হলে ফাসিক ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হবে আর গ্রহণ করা না হলে মাফ করা হবে না।
- শাফায়াতের ব্যাপারে সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী শুধুই আল্লাহ্। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।

"শুফায়া' থেকে শুরাকা" এটা হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত শিরকের সূত্র সমূহের একটি। তাই নিজের জন্য শাফায়া'তকারী হিসেবে পীর ধরলে শিরকের পথ সুগম করা হবে। তবে নিজের পরামর্শক হিসেবে কোনো আলিমের কাছে যাওয়া দূষের নয়।

পরিভাষাঃ ৬০. আল্লাহর উপর মিথ্যাচারঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। অথচ অনেকে-ই একাজটি করে থাকেন। আমাদের সমাজে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয় না ভাবে..

- আল্লাহ্ বলেননি এমন কোনো কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ্ নাকি বলেছেন "বান্দা তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ"। ইত্যাদি।
- যা দেওয়ার অধিকার শুধু-ই আল্লাহর হাতে এমন কোনো কিছুকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন.. এমন দাবী করা যে আমার কাছে ওহী আসে। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তান, সম্পদ বা অন্য কোনোকিছু দিতে পারেব বলে মনে করা।
- যে কথা বলার অধিকার শুধুই আল্লাহর এমন কিছু বলে ফেলা। যেমন আল্লাহ বা রাসূল থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত না হলেও কোনো বিষয়ে মন্তব্য করে বলা "এটা হারাম বা এটা হালাল"।

উল্লেখ্য মুজতাহিদ ঈমামগণ বা পূর্ববর্তি আলিমগণ সাধারণত এমন বলতেন না। সাধারণত উনারা বলতেনঃ এতা করবে, এটা করবে না। এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। এটা করতে সমস্যা নেই, এটা করা উচিত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে সবকিছুকেই সাফ হারাম, হালাল, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। মনে রাখবেন আলিম উলামা মানুষকে উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু বিধান দিতে পারেন না।

বিঃ দ্রঃ = বিধান দেওয়া বা বিধান তৈরি করা একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণ একাজটি করে থাকেন। তবে আল্লাহ এবং রাসূল কখনো কখনো কোনো আইন বা বিধানের সূত্র উল্লেখ করেছেন। এসব সূত্র ধরে আইন তৈরি করতে পারবে মানুষ, করতে পারবেন আলিমগণ।

পরিভাষাঃ ৬১. ইস্তিহযা বা দ্বীন নিয়ে হাসি তামাশাঃ দ্বীন বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-তামাশা করা এবং দ্বীন বা দ্বীনি বিষয়াদিকে খেল-তামাশায় পরিণত করা কুফর। যারা এমন করে তাদের প্রত্যাখ্যান করা ও বর্জন করা ফরজ। কোনো মুসলিম কুফর করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন সে হয়ে যায় ঈমানহীন মুসলিম তথা মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। কিয়ামতের দিন মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তবে মানুষকে উপদেশ দিতে হয় বা ওয়াজ নসিহত করতে হয় এবং এসব করতে হয় কুরআন দিয়ে আর (কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে) হাদীছ দিয়ে, মনগড়া কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে নয়।
দ্বীনি বিষয়াদিকে খেল-তামাশায় পরিণত করার ধরণঃ আমাদের সমাজের অনেক মানুষ অনেক ভাবে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-তামাশা করে থাকে এবং দ্বীনকে তামাশার পাত্রে পরিণত করে। যেমন..

- অনেক গায়ক দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিকে গানবাজনার মাধ্যমে হাঁসির ছলে উপস্থাপন করে কৌতুক করে থাকে। তারা বিষয়কে হাসির পাত্রে পরিণত করে। বিশেষ করে কিছু বাউল শিল্পীদেরকে দেখা যায় তারা মৃত্যু, কবর, হাশর, ফুলসিরাত, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি নিয়ে গান করেন এবং হাঁসি কৌতুকের ছলে বাদ্যযন্ত্রের তরঙ্গে এসব উপস্থাপন করে থাকেন।
- কিছু কিছু কৌতুক শিল্পীও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাঁসি কৌতুক করে থাকে।
- কোনো কোনো সাহিত্যিকও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে ব্যঙ্গ করে রচনা, কবিতা, গান বা নাটক লিখে থাকেন।
- একদল ভন্ডপীর আজব আজব থিউরী উপস্থাপন করে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিকে হাঁসির খোরাকে পরিণত করেন।
- অনেক প্রযোজক ও পরিচালক তাদের নাটকে, সিনেমায় বা সিরিয়ালে দ্বীনি বিষয়াদি বা দ্বীনি চরিত্রকে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যেন এসব হাঁসির খোরাকে পরিণত হয়।
- কিছু কিছু হুজুরও উনাদের ওয়াজে বা বক্তৃতায় কোনো কোনো বিষয়কে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যাতে এটা হাঁসির তামাশায় পরিণত হয়।

- অনেকে আবার যিকিরের নামে ডান্স করে এমন ভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে যা দেখতে তামাশার মত-ই লাগে;
- অনেক গ্রাম্য মাতবরদেরকেও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাঁসি মশকারা করতে দেখা যায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের সমাজের নানা জনে নানা ভাবে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাঁসি তামাশা করেন। এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কুফরের মত মারাত্মক পাপ হলেও এটা তাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে।

পরিভাষাঃ ৬২. রাসূল পরিচিতিঃ নূহ আঃ পৃথিবীর প্রথম রাসূল। তিনি হলেন নূহ বিন লামিক বিন মাতুশলাহ' বিন খানূখ (অপর নাম ইদরীস আঃ) বিন ইয়ারিদ বিন মাহলাঈল বিন ক্বাইনিন বিন আনুশ বিন শীশ বিন আদম আঃ।
আল্লাহ যুগে যুগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন যেন মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪)
যে বা যারা তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে তারা মুসলিম আর যে করে না সে কাফির। আর যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করবে কিন্তু বাস্তব জীবনে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করবে না সে মুনাফিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আল্লাহ, রাসূল, আলীম, উলামা ও ইমাম মানাঃ আমরা অবশ্যই আলীম উলামা ও ইমামগণকে মান্য করব। তবে মনে রাখতে হবে উনাদের মান্য করারও একটি সীমারেখা রয়েছে। আমরা আল্লাহকে আল্লাহ হিসেবে, রাসূলকে রাসূল হিসেবে, আলীমকে আলীম হিসেবে আর ইমামকে ইমাম হিসেবে মান্য করব, নবী হিসেবে নয়। আমাদের মনে রাখতে হবেঃ আলীম উলামা, পীর-মাশায়েখ আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক। আমরা উনাদেরকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করব, মর্যাদা দেব অবশ্যই। তবে উনারা আমাদের রাব্ব বা বিধানদাতা নন এবং নবীও নন। তাই আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃর সুন্নতের বিপরীতে উনাদের কারো কথা মেনে নেওয়া যাবে না। আর এটা-ই ইসলামের মূল শিক্ষা এবং মাযহাবী ইমামগণের শিক্ষাও এটা-ই। ইমাম আবু-হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ সবাই বলে গেছেন "আমার কথার বিপরীতে সাহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে তোমরা আমার কথা বাদ দিয়ে হাদীছকে আকড়ে ধরবে এবং এটা-ই আমার শেষ কথা"।

পরিভাষাঃ ৬৩. আযল বা জন্মনিয়ন্ত্রণঃ সূরাহ আনয়া'মের ১৫১ তম আয়াতে দরিদ্রতা, অভাব বা ভরন পোষনের ভয়ে সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আজকাল অনেকেই এমন আশংখা থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রন করে থাকেন। তাই জন্ম নিয়ন্ত্রনের বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হল..
আগেকার দিনে জন্মনিয়ন্ত্রণের একমাত্র পদ্ধতি ছিল আ'যল। যৌন মিলনের শেষের দিকে নারি যোনির বাইরে বীর্যপাত করাকে আ'যল বলা হয়। আর বর্তমানে জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রধানত দুটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। যথা স্থায়ী পদ্ধতি ও সাময়িক পদ্ধতি।
অপারেশনের করে পুরুষ বা নারীর ভিতরের রগ কেটে প্রজজন যন্ত্রের সাথে অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তখন আর পুরুষের বীরযে থাকা শুক্রানোর সাথে নারী ডিম্বের সমন্বয় ঘটে না। তাই জন্তান জন্ম নেবার সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়।
আর অস্থায়ী পদ্ধতি বা সাময়িক পদ্ধতি কয়েক ভাবে হয়ে থাকে। যেমনঃ কন্ডম, পিল, ইনজেকশন, ইত্যাদি। কন্ডম ব্যবহারে পুরুষের বীরযে থাকা শুক্রানোগুলো কন্ডমের ভিতরে-ই থেকে যায়। তাই নারীর জরায়ুতে থাকা ডিম্বের সাথে এর সাক্ষাৎ ঘটেনা। ফলে সন্তান জন্ম হয় না। আর আর পিল বা ইনজেকশনের মাধ্যমে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে শুক্রানো এবং ডিম্বকে ভিতরে-ই মেরে ফেলা হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দরিদ্রতার ভয়ে বা রিজিকের অভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাত (প্রভূত্ব) প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। তাই এমন কাজ কুফরের নামান্তর। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে বা কোনো কারণ ছাড়া শুধু এখন সন্তান নিতে মন চাচ্ছে না বিধান জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে কুফর হবে না।

আইন ও বিধানঃ জন্মনিয়ন্ত্রের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টি বদলে ফেলা হয়। আর জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি নিষিদ্ধ নয় তবে উত্তমও নয়। কারণ একাধিক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবাগণ নিজ নিজ দাসীর সাথে আ'যল করার জন্য রাসূল সা.'র কাছে অনুমতি চেয়েছেন। রাসূল সা. তাদের নিষেধ করেননি আবার সুস্পষ্ট অনুমতিও দেননি। (দেখুন সূরাহ ইসরা- ৩১)

পরিভাষাঃ ৬৪. বীর্যঃ বীর্য পাক, না নাপাক তথা পবিত্র, না অপবিত্র? এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এনিয়ে ফিক্বহী ইমামগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সাধারণত এ বিষয়ে ৩টি মত পাওয়া যায়। যেমন..
১ম মতঃ এ বিষয়ে একটি মত হল পেশাব ও রক্তের মত বীর্য অপবিত্র বস্তু। তাই বীর্য তরল হোক বা শুষ্ক, শরীরে বা কাপড়ে বীর্য লেগে থাকলে অবশ্যই ধোয়ে সাফ করতে হবে। এটি হল ইমাম মালিক রাহিঃর অভিমত।
২য় মতঃ বীর্য অপবিত্র তবে তরল বীর্য শরীরে বা কাপড়ে লেগে থাকলে এটা ধোয়ে সাফ করতে হবে আর বীর্য শুকিয়ে গেলে শুধু আঙ্গুল দিয়ে বা হাত দিয়ে ডলে নিলে-ই চলবে। শুকনা বীর্য ধোয়া আবশ্যক নয়। ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এ মতটি ব্যক্ত করেছেন। (কারণ আ'ইশাহ রাঃ থেক এ ব্যাপারে হাদীছ বিদ্যমান আছে তিনি রাসূল সা.র কাপড় থেকে শুকনা বীর্য ডলে দিয়েছেন আর রাসূল সা. এ কাপড় গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করেছেন)

৩য় মতঃ এ ব্যাপারে ৩য় মতটি হল মুখের থুথু এবং কফ আর নাকের শ্লেষ্মার মত বীর্য হল পবিত্র বস্তু। (কারণ পবিত্র কুরআনে বীর্যকে পানি বলা হয়েছে এবং হাদীছেও এটাকে থুথুর সাথে তুলনা করা হয়েছে আর কুরআন বা হাদীছের কোথাও বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি।) এ মতটি পোষণ করেছেন ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম আহমদ রাহিঃ। (এ ব্যাপারে জানতে দেখুন সূরাহ সিজদাহঃ ৩২/৮)

পরিভাষাঃ ৬৫. কিয়ামত বা মহা-প্রলয়ঃ পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে মহা-প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে এবং এর নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামত যে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর মহা প্রলয় ঘটানো আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ। বর্তমান বিজ্ঞানও এর প্রমান পেয়েছে।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে, আমাদের এ পৃথিবী ঘন্টায় ১৬৭০ কিলো মিটার (১০৪০ মাইল) বেগে ঘূর্ণায়মান রয়েছে। আর যে বস্তু যত বেগে ঘূর্ণায়মান হয় তার অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ সমান বেগেই ঘূর্ণায়মান হয় আর হঠাৎ যদি মূল বস্তুটি থেমে যায় তবে এর ভিতরের সবকিছু সমান গতিতে ছুটে চলে। অর্থাৎ মাত্র এক সেকেন্টের জন্য যদি পৃথিবীর গতিকে থামিয়ে রাখা হয় তবে পৃথিবীর উপরি ভাবগের সবকিছু ঘন্টায় ১৬৭০ কিলো মটার (১০৪০ মাইল) বেগে ছিটকে পড়বে। সারা পৃথিবী ব্যাপী তৈরি হবে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার এক ভয়ানক সোনামী। সাগরের সব পানি পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্য দিকে আছড়ে পড়বে। আর এভাবে-ই হয়ে যাবে মহাপ্রলয়।

পরিভাষাঃ ৬৬. ফিরাশঃ পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে পৃথিবীর উপরীভাগের ফিরাশের কথা বলা হয়েছে। ফিরাশ অর্থ বিছানা বা কার্পেট। কোন বস্তুর উপরীভাগে সমান্তরালভাবে বিছানো বস্তুকে ফিরাশ বলা হয়।
জ্ঞাতব্যঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পৃথিবীর উপরে বিছানো আছে মাটির আবরণ। যাকে পৃথিবীর ত্বক বা চামড়া বলা হয়। এ ত্বক অনেকটা কার্পেটের মত এবং প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর। বিষয়টি সম্পর্কে একটু ভালো করে জানতে দেখুন সূরাহ যারিয়াত (৫১/৪৭-৪৮) সেখানে চিত্রসহ দেওয়া আছে।

পরিভাষাঃ ৬৭. হেদায়াতঃ মূল আরবী শব্দ "হিদায়াহ"। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় হেদায়ত। হেদায়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।
হিদায়াহ অর্থ পথ প্রদর্শন করা, পথের দিশা দেওয়া, সঠিক পথে পরিচালিত করা, গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া, ইত্যাদি। ইসলামে হেদায়াতের দুটি ধাপ রয়েছে। যথা.. পথ দেখিয়ে দেওয়া আর সঠিক পথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

১ম ধাপঃ হেদায়াতের প্রথম ধাপ হলো পথ দেখিয়ে দেওয়া এবং পথের দিশা দেওয়া। এ ধরণের হেদায়াত আসলে শুধুই ইনফারমেশন, শুধুই তথ্য দিয়ে সাহায্য করা। তথ্য আদান প্রদান আবার দুই ভাবে করা যায়। যথা মৌখিক ভাবে আর লিখিত ভাবে।
নবী ও রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতকে প্রথম ধাপের হেদায়াত করে থাকেন অর্থাৎ উনারা সঠিক পথের দিশা দেন এবং সঠিক পথ বাতলে দেন। আর নবী রাসূলগণের অনুপস্থিতিতে এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

চূড়ান্ত ধাপঃ হেদায়াতের চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে সঠিক পথে পরিচালিত করে একেবারে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। যে কাজটি করতে পারেন শুধুই আল্লাহ্ তায়া'লা। শুধু আল্লাহই পারেন কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দিতে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ (এমনকি নবী রাসূলগণ পর্যন্ত) এমন হেদায়াত করতে পারেন না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ ক্বাস্বাস্ব এর ৫৬ তম আয়াতে।

আল-কুরআনঃ আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠককে উভয় প্রকার হেদায়াতই করতে পারে। আল-কুরআন তার সকল পাঠককে সঠিক পথ প্রদর্শন করে তথা সঠিক পথের দিশা দেয়। তাইতো আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর কিতাবকে "হুদা-ল-লি-ন-নাস" তথা সকল মানুষের জন্য হেদায়াতকারী (পথ প্রদর্শক) বলা হয়েছে এবং অন্যত্র বলা হয়েছে "হুদা-ল-লি-ল-আ'লামীন" তথা বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। আর সূরাহ বাক্বারার শুরুর দিকে বলা হয়েছে "হুদা-ল-লি-ল-মুত্তাক্বীন" তথা মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত অর্থাৎ যে বা যারা আল-কুরআনে বর্ণিত পাপপুণ্যের বিধান মেনে চলবে এবং যাবতীয় কুফর, শিরক ও কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে আল-কুরআন তাদেরকে সঠিক গন্তব্যে তথা জান্নাতে পৌঁছে দেবে এবং এ পর্যন্ত সঙ্গ দেবে।

আনুচ্ছেদঃ ১১. আল-কুরআন থেকে বিধান বের করার পদ্ধতি

প্রারম্ভিক কথাঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ন জীবন আদর্শ। বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য যে জীবন আদর্শ ঠিক করে দিয়েছেন এর-ই নাম ইসলাম। ইসলাম আমাদের জন্য মহান আল্লাহর মনোনিত একমাত্র দ্বীন তথা জীবন আদর্শ। ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ। অর্থাৎ এক আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা। আর একেই বলে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করা। ইসলামের দুটি দিক রয়েছে। যথাঃ ঈমান ও আমল।

- ঈমান ইসলামের বিশ্বাসগত এবং নৈতিক ও আদর্শিক দিক;
- আর আমল হচ্ছে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনগত দিক; যা আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

সকল প্রকার ত্বাগূত (আল্লাহ্ বিরোধী ব্যক্তি ও শক্তি)কে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের বিশ্বাসগত বিষয় সমূহের উপর সম্পূর্নরূপে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং নৈতিক ও আদর্শিকভাবে এসব মেনে নেওয়ার নাম ঈমান, আর ঈমান আনার

পর ইসলামের বিধিবিধান ও নিয়মনীতি মেনে বাস্তব জীবন পরিচালনা করার নাম আ'মল। আ'মল করার জন্য তথা বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য ইসলাম আমাদেরকে যেসব বিধিবিধান দিয়েছে এর নাম শারীয়া'হ।

ইসলামী শারীয়া'হ আসলে বাস্তব জীবনে মেনে চলার আইন বা বিধান। শারীয়া'হ আইনের মূল উৎস আল-কুরআন। তবে আল-কুরআনে অনেক আইন সুস্পষ্ট থাকলেও মানুষকে নানামুখী সুযোগ দেওয়ার জন্য কিছু বিষয়কে অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আর কিছু বিষয় সরাসরি উল্লেখই করা হয়নি, যাতে করে মানুষ এসব বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ জাতি ও মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

আল-কুরআনে যেসব বিষয় অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে অথবা যেসব বিষয় সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি ওইসব বিষয়ে হাদীছ বা সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। (আর ফিক্বহী বিধান বের করতে এটাই সকল মাযহাব এবং সকল ইমামের ঐক্যবদ্ধ ফর্মুলা।)

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল-কুরআন শুধু একটি আইন বই-ই নয়। আল-কুরআন একটি ইউনিক বুক, যাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মূল উপাদান ও মৌলিক নীতিমালা। যেমন..

- আইন ও বিধান,
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য
- তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত অনেক বিষয়
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক সূত্র ও তথ্য
- ঈমান ও আক্বীদাহ
- রূহ জগত, দুনিয়ার জীবন, বারযাখ জগত ও আখেরাত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য
- জিন্ন, ইনসান, ফিরিস্তা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পাহাড়, নদী, সাগরসহ নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য
- ইবাদাত বন্দেগীর নিয়ম পদ্ধতি
- পারিবারিক ও সামাজিক আইন ও শিষ্টাচার
- জাতি গঠন ও দেশ গঠনের প্রয়োজনীয় উপায় ও উপকরণের বর্ণনা
- যুদ্ধনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি
- ন্যায়, সাম্য ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা
- অর্থনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষানীতি,
- শত্রুতা ও মিত্রতার নীতিমালা
- আত্মীতা বা পারস্পারিক সম্পর্কের নীতিমালাসহ জীবনের প্রয়োজনীয় আরো কতকিছু।

তাই আল-কুরআনকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হয়, আল-কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে হয় এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় আইন বা বিধান আল-কুরআন থেকে বের করে আনতে হয়।
আল-কুরআন থেকে আইন ও বিধান বের করাকে বলা হয় "ইস্তিখরাজ ও ইস্তিমবাত"। আর এ ইস্তিখরাজ ও ইস্তিমবাত নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা "আল-কুরআন থেকে আইন ও বিধান বের করার পদ্ধতি"।
বিষয়টিকে সহজ ভাবে উপস্থাপনের জন্য এ অধ্যায়কে আমরা ৪টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা..

১ম অনুচ্ছেদঃ মুহকাম ও মুতাশাবিহ
২য় অনুচ্ছেদঃ আদেশ (আমর)
৩য় অনুচ্ছেদঃ নিষেধ (নাহি)
৪র্থ অনুচ্ছেদঃ সংবাদ (খবর)

১ম অনুচ্ছেদঃ মুহকাম ও মুতাশাবিহ

আল-কুরআনের সকল আয়াত এক ধরণের নয় বরং আল-কুরআনের আয়াতসমূহ প্রথমত দুই ধরণের হয়ে থাকে। যথাঃ মুহকাম ও মুতাশাবিহ। ইরশাদ হচ্ছে..

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)

(হে মুহাম্মাদ!) আল্লাহ তোমার উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন এর কিছু আয়াত মুহকাম এবং এগুলোই কিতাবের মূল আর কিছু হলো মুতাশাবিহ। যেসব লোকের অন্তর রুগ্ন তাদের কেউ কেউ ফিতনাহ করার জন্য আর কেউ কেউ মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটবে। আসলে এসবের মর্ম কেউ জানতে পারবে না আল্লাহ

ছাড়া। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ষ তারা বলবেঃ আমরা এসব মেনে নিয়েছি। সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত। গ্রহণ করে কেবল জ্ঞানী লোকেরাই। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭)

জ্ঞাতব্যঃ মানার ব্যাপারে আল-ক্বুরআনের আয়াতসমূহ দুই ধরণের হয়ে থাকে। যথাঃ মুহকাম ও মুতাশাবিহ।

মুহকামঃ বিধান সম্বলিত সুস্পষ্ট আয়াতকে মুহকাম বলা হয়। আল-কুরআন আমাদের জীবন বিধান। তাই মুহকাম আয়াতসমূহই আল-ক্বুরআনের মূল বিষয়। মুহকাম আয়াত বিধান ও আইন সম্পর্কিত।

মুতাশাবিহঃ আল-ক্বুরআনের কিছু আয়াত একাধিক অর্থ সম্বলিত ও ব্যাখ্যা নির্ভর। এসব আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন খুবই কঠিন। কারণ মহান আল্লাহ এসবের মর্ম কাউকে বাতলে দেননি। বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী এসব আয়াতকে মুতাশাবিহ বলা হয়।

আমাদের করনীয়ঃ মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাপারে আমাদের করনীয় হচ্ছে মুহকাম আয়াতসমূহ মেনে নেওয়া এবং এসব আয়াতে বর্ণিত আইন ও বিধানসমূহ মেনে চলা। আর এটাই আমাদের ফরজ দায়িত্ব। মুহকাম কোনো আয়াত বা এর বিধান অমান্য করা কুফর। মুহকাম আয়াত না মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তখন ইবাদাত বন্দেগী কিছুই কবুল হয় না, সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

আর মুতাশাবিহ আয়াত সমূহে যথাযত বিশ্বাস রেখে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে এভাবেই ছেড়ে দিতে হয়। এটাই নিয়ম, এটাই আল্লাহর হুকুম, এটাই নবীর তরিকাহ। কিন্তু কিছু মানুষ এসব নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে। মানুষ মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে দুই কারণে..

- মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য
- ফিতনাহ করার জন্য।

পরিণামঃ যারা মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে তারা পন্ডুশ্রমী। তারা কখনো সফল হবে না। কারণ আল-ক্বুরআন আল্লাহর কালাম। এর সঠিক ব্যাখ্যা শুধু আল্লাহরই জানা। আর এসব আয়াতের ব্যাখ্যা যেহেতু আল্লাহ থেকে পাওয়া যায়নি তাই হাজারো চেষ্ঠা করেও এর সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। তবে বিভ্রান্ত ও বিক্রিত মনের লোকেরা এসব আয়াতের নানা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে লোকজনকে বিভ্রান্ত করে থাকে। আর আল্লাহর রহমত ও হেদায়ত বঞ্চিত লোকেরা ওইসব লোকের অনুকরণ করে বিভ্রান্ত হয়।

আসল কথা হল যেসব আয়াতের সাথে মানব জীবনের কোনো আইন বা বিধান সম্পৃক্ত নয় এবং যেসব আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়, এমন আয়াত নিয়ে যারা পান্ডিত্য জাহির করেন তাদের অন্তর রুগ্ন, তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং অন্য মানুষকেও বিভ্রান্ত করে। তাই এসব বিক্রিত মনাদের বর্জন করা একান্ত আবশ্যক। বর্ণিত হচ্ছে..

আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ যারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে তোমরা এদের বর্জন করবে। আর মনে করবে ("যাদের অন্তর রুগ্ন" একথা বলে) আল্লাহ এদের কথাই বলেছেন। (তাফসীর কুরতুবীঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে। মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = বিধান বের হবে শুধুই মুহকাম আয়াত থেকে, মুতাশাবিহ আয়াত থেকে কোন বিধান বের হবে না। এরমাঝে কিছু মুহকাম আয়াত আছে যেগুলোর বিধান ও বর্ননা দুটুই সুস্পষ্ট এসব আয়াতের কোনো বিষয়েই অভিমত বা ভিন্নমত বোইধ নয়, গ্রহনযোগ্য নয় বরং এসব আয়াতের সাথে দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষন করা কুফর। আর কিছু মুহকাম আয়াত আছে যেগুলোর বিধান সুস্পষ্ট হলেও বিষয়বস্তুতে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। এসব আয়াতের অস্পষ্ট বিষয়ে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত গ্রহনযোগ্য হয়ে থাকে।

২য় অনুচ্ছেদঃ আদেশ সূচক শব্দ (আমর)

আল-কুরআন থেকে বিধান বের করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলো হচ্ছে আল-কুরআনে ব্যবহৃত আদেশ সূচক শব্দসমূহ, যাকে আরবীতে বলা হয় "আমর"।

শব্দ পরিচিতিঃ আরবী امر (আমর) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ

১. বিষয়ঃ আরবী (امر) শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয় এর একটি হচ্ছে "বিষয়"। আমর শব্দটি মাঝে মাঝে বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ আরবরা বলে থাকে.. (هذا امرُنا) এটা আমাদের বিষয়। সূরাহ আ-ল ই'মরানে বলা হয়েছে..

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)	(হে নবী) তাদের তাওবাহ কবুল করা বা পাপের কারণে তাদের সাজা দেয়ার বিষয়টি তোমার এখতিয়ারাধীন নয়

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (117)	...তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু বলেন "হও" আর হয়ে যায়। (বাক্বারাহঃ ১১৭)

২. সিদ্ধান্তঃ আরবী (امر) শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয় এর একটি হলো "সিদ্ধান্ত"। পবিত্র কুরআনেও আমর শব্দটি মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٤٧ النساء)	আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবেই

৩. কর্তৃত্বঃ আরবী (امر) শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয় এর একটি অর্থ "কর্তৃত্ব"। পবিত্র কুরআনেও আমর শব্দটি মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

..তারা বলে আমাদের কি কোনো কর্তৃত্ব নেই? বলে দাও! সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর.. (৩ আল-ই'মরানঃ ১৫৪)

৪. আদেশ, অনুরোধ ও আবেদনঃ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও আরবী امر (আমর) শব্দটি আসলে "আদেশ" বা "অধ্যাদেশ" অর্থেই খ্যাত এবং ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কাউকে কোনোকিছু করতে হুকুম দেওয়ার নাম আদেশ তবে আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করেও সব সময় আদেশ উদ্দেশ্য থাকে না বরং মাঝে মাঝে অনুরোধ বা আবেদনের অর্থেও আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর এজন্যই উসুলে ফিক্বহ এর সূত্র মতে (امر) বা আদেশ সূচক শব্দের ব্যবহারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ امر – التماس – عرض তথা আদেশ, অনুরোধ ও আবেদন।

আদেশঃ কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থদের জন্য আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করলে এবং এ আদেশ পালন করা বাধ্যতামূলক মনে করলে আইনের ভাষায় বা সামাজিক পরিভাষায় এটাকে আদেশ বলা হয়।

অনুরোধঃ সম মানের ব্যক্তি একে অন্যকে আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করে কিছু বললে আইনের ভাষায় বা সামাজিক পরিভাষায় এটাকে অনুরোধ বলা হয়।

আবেদনঃ অধীনস্থ কেউ উর্ধতন কারো কাছে আদেশ সুচক শব্দ ব্যবহার করে কিছু বললে এটাকে অনুরোধ বলা হয়। আর বান্দা যখন এমন শব্দ ব্যবহার করে প্রভূর কাছে কিছু চায় তখন এটাকে বলা হয় দোয়া।

আদেশ (امر) এর ফিক্বহী সংজ্ঞাঃ উসুলে ফিক্বহ তথা ফিক্বহী মূলনীতি বিষয়ক কিতবাদিতে (امر) এর সংজ্ঞা দুই ভাবে দেওয়া হয়েছে। যথা..

طلب الفعل علي سبيل الاستعلاء	নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখে কাউকে কিছু করতে বলা
طلب الفعل لزوما	বাধ্যতা মূলক ভাবে কিছু করতে বলা

উল্লেখিত সংজ্ঞা মতে আদেশ দাতাকে আদেশ গ্রহিতার উপর কর্তৃত্বশীল হতে হবে এবং আদেশকৃত কাজ আদায় করিয়ে নিতে সক্ষম হতে হবে। সাথে সাথে আদেশ বাস্তবায়নে পুরস্কার আর আদেশ লঙ্ঘনে সাজা দেয়ার অধিকার ও ক্ষমতা থাকতে হবে। কেবল এমন হলেই এটা (امر) তথা আদেশ হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় আদেশ সুচক শব্দ ব্যবহার করলেও এটা আদেশ হবে না বরং অনুরোধ বা আবেদন হয়ে যাবে। তাইত উসুলে ফিক্বহ তথা ফিক্বহের মূলনীতি বিষয়ক কিতাব সমূহে বলা হয়েছেঃ

ترك الامر معصية وجزاء المعصية العقاب	আদেশ লঙ্ঘন পাপ আর পাপের পরিণতি সাজা

তাই আদেশ লঙ্ঘিত হলে সাজা দানে অক্ষম ব্যক্তির আদেশসূচক শব্দকে উসুলের পরিভাষায় আদেশ বলা হয় না।

আদেশ জারি করার অধিকারঃ ইসলামী বিধান মতে আদেশ করার বা অধ্যাদেশ জারি করার একক অধিকার আল্লাহর। মহান আল্লাহই এর একমাত্র বৈধ অধিকারী। ইরশাদ হচ্ছেঃ

...শোনো! সৃষ্টি আল্লাহর তাই আদেশ দেয়ার অধিকারও শুধুই তাঁর। আল্লাহ মহান, সর্বজগতের রাব্ব। (৭ আ'রাফঃ ৫৪)	أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54)

পর্যালোচনাঃ আসলে আদেশ দেবার বা অধ্যাদেশ জারি করার একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ্ তায়া'লা। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ আদেশ দিলে বা অধ্যাদেশ জারি করলে এটা অবশ্যই আল্লাহর বিধান মেনে এবং আল্লাহর অনুমোদনেই করতে হবে। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে আদেশ দেওয়া বা অধ্যাদেশ জারি করা কুফর এবং এসব আদেশ বা অধ্যাদেশ মেনে নেওয়া শিরক।

তবে হাঁ.. মহান আল্লাহ তদীয় রাসূলকে ক্ষেত্র বিশেষে আদেশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর রাসূল সাঃর প্রতিনিধি হিসেবে এমন ক্ষমতা ইসলামী সরকার প্রধানের উপর এসে যায়। তাই আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি ঠিক রেখে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে সামাজিক পরিসরে সরকার প্রধান অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা রাখেন। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর (কারণ এটাই আনুগত্যের মূল) আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের কর্তা ব্যক্তিদের...। (৪ নিসাঃ ৫৯)

আল-কুরআন ও আদেশসূচক শব্দঃ আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআনে যেসব আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এসবই আল্লাহর। যেহেতু আল্লাহর আদেশ ফরজ হয়, তাই নিয়মমত আল-কুরআনের আদেশ সূচক সকল শব্দ দ্বারাই ফরজ প্রমাণিত হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। আল-কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায় আল-কুরআনে ব্যবহৃত আদেশ সূচক সকল শব্দ ফরজ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং ফরজ, মুস্তাহাব ও অনুমোদন এ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিষয়টিকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য আমরা এ অনুচ্ছেদকে ৪টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্থ করেছি। যথা..

১ম পরিচ্ছেদঃ ফরজ
২য় পরিচ্ছেদঃ মুস্তাহাব
৩য় পরিচ্ছেদঃ অনুমোদন
৪র্থ পরিচ্ছেদঃ ধমক
৫ম পরিচ্ছেদঃ চ্যালেঞ্জ

১ম পরিচ্ছেদঃ ফরজ

আল্লাহ্ আমাদের মালিক আর আমরা আল্লাহর দাস। আমাদের নিজেদের উপর এক আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং দাস হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব আর এরই নাম আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করা।

যেহেতু আল্লাহর আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল তাই স্বাভাবিক নিয়মেই আল্লাহর আদেশ মেনে চলা ও মেনে নেওয়া আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় যাকে ফিক্বহের পরিভাষায় বলা হয় ফরজ।

তাই আল-কুরআনে যদি কোনো বিষয়ে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং এ কাজটি ফরজ হবার বিপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো কারণ বিদ্যমান না থাকে তবে এ বিধান মেনে চলা আমাদের উপর ফরজ হয়। যেমন..

উদাহরণঃ ১. মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। কারণ এ ব্যাপারে আদেশ এসেছে পবিত্র কুরআনে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

তোমরা সবাই **ঐক্যবদ্ধ** ভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকবে, তোমরা দলেদলে বিভক্ত হয়ে যাবে না (৩/১০৩)	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

পর্যালোচনাঃ উপরের আয়াতে দুটি আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা..

১. ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকা
২. দলেদলে বিভক্ত না হওয়া।

এবং এ আদেশ দুটি ফরজ হওয়ার বিপরীতে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রতিবন্ধকও নেই। তাই এ দুটি কাজ করা অর্থাৎ সদা একতাবদ্ধ থাকা এবং দলেদলে বিভক্ত না হওয়া দুনিয়ার সকল মুসলিমের উপর ফরজ তথা অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের মূল শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য। দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একতাবদ্ধ, একই সমাজ ভুক্ত, একই নেতা ও একই শাসনের আওতাধীন। মুসলিম ঐক্যের এমন একক ফর্মূলার নাম খিলাফাহ। আল্লাহর আদেশ পালন করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করে ছিলেন রাসূল সাঃ। পরে এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছিলেন খালীফাহগণ।

- প্রথমে খুলাফা রাশিদীন,
- তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ,
- তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ,
- সবশেষে উছমানী খিলাফাহ।

কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খালীফাহ। তখন..

- রাসূল সাঃর হাতে গড়া তাওহীদী সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরি সমাজ।
- কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মনগড়া বিধান।

- এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি।
- মুসলিম জাতীয়তাবাদের জায়গা চালু হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- খিলাফাহর জায়গা দখল করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি।
- ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জাগায় চালু হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি।

আর এভাবেই মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

× উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)

× বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

× যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। (দেখুন আনয়া'মঃ ১৫৯)

× আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

× সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাস্য মতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাতে বুঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

উদাহরণঃ ২. তিন জনের আনুগত্য করা ফরজ। এ ব্যাপারে আদেশ দিয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ	মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের (মুসলিমদের) মধ্য থেকে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী হবে তাদের। (৪/৫৯)

পর্যালোচনাঃ উপরের আয়াতে ৩ টি আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা..

১. আল্লাহর আনুগত্য করা

২. রাসুলের আনুগত্য করা

৩. দায়িত্বশীল মুসলিম ব্যক্তিদের আনুগত্য করা।

এ আদেশ ৩টি ফরজ হওয়ার বিপরীতে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রতিবন্ধকও নেই। তাই এ ৩টি কাজ করা আমাদের ফরজ তথা অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

জ্ঞাতব্যঃ শারীয়া'হ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, আনুগত্য করতে হয় রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব।
- রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। তাই রাসূলের কোনো হাদীছ আল্লাহর আয়াতের বিপরীত হলে এটা মেনে নেওয়া হবে না।
- আর সামাজিক ও রাজনৈতিক সৃংখলা বজায় রাখাতে দায়িত্বশীল ও কর্তৃত্বশীল মুসলিম কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য করতে হবে তবে এ আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। তাই কোনো নেতা, কোনো আলীম বা পীর বা অন্য কারো আদেশ আল্লাহ ও রাসূলের বিপরীত হলে এটা মেনে নেওয়া হবে না।
- আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়।

সতর্কতাঃ উল্লেখিত ৩ শ্রেণীর আনুগত্যের বাইরে গিয়ে আর কারো আনুগত্য করা যাবে না। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (48)

আর (শোনো!) কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য মেনে নেবে না (যদিও এ জন্য অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়) বরং তাদের দেওয়া কষ্ট/সাজা উপেক্ষা করে চলবে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। আর (মনে রাখবে) উকীল (রক্ষক) হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। (৩৩ আহযাবঃ ৪৮)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর হুকুমের বাইরে গিয়ে কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য করা বিভ্রান্তি, ক্ষেত্র বিশেষে যা কুফর পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু অত্যান্ত প্রিতাপের বিষয় হল; আমাদের সমাজের অনেকে-ই নেতা-নেত্রী, বাবা-মা, মুরব্বি, ইমাম, পীর বা হুজুরের আনুগত্য করতে গিয়ে শারীয়া'হ নীতির বাইরে গিয়ে এমন কুফর করে থাকেন। যারা এমন করেন তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই সাবধান! বন্ধুগণ! সাবধান!!

উদাহরণঃ ৩. হাজ্জ ফরজ তবে (অনেক ইমামের মতে) উমরাহ ফরজ নয়। যদিও উভয় কাজের জন্য একই আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

أتموا الحج والعمرة لله	হাজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ করবে শুধুই আল্লাহর জন্য

পর্যালোচনাঃ উপরের আয়াতে দুটি আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা.. হাজ্জ পূর্ণ করা এবং উমরাহ পূর্ণ করা আর উভয় কাজই করতে হবে শুধুই আল্লাহর জন্য। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল হাজ্জ ফরজ হলেও (অনেক ইমামের মতে) উমরাহ ফরজ নয় বরং উমরাহ করা সুন্নত, মুস্তাহাব বা নফল।

কারণ হাজ্জের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং হাজ্জ ফরজ হবার বিপরীতে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। আর উমরাহর আদেশ দেওয়া হলেও উমরাহ ফরজ হবার বিপরীতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। আর এটা হল রাসূল সাঃর বাস্তব অনুশূলনী। রাসূল সাঃ ছিলেন আল্লাহর কিতাবের বাস্তব নমুনা। রাসূল সাঃ হাজ্জকে ফরজ বলেছেন কিন্তু উমরাহকে ফরজ বা আবশ্যক মনে করেননি বরং ঐচ্ছিক মনে করেছেন।

উদাহরণঃ ৪. স্ত্রীর মোহর আদায় করা ফরজ। এ ব্যাপারে আদেশ দেয়া দিয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	তোমরা খুশী মনে স্ত্রীদের মোহর (পরিপূর্ন ভাবে) আদায় করবে.. (৪/৪)

পর্যালোচনাঃ উক্ত আয়াতে মুসলিমদের আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন নিজ নিজ স্ত্রীদের মোহর আদায় করে। এবং বিষয়টি ফরজ হবার বিপরীতে অন্য কোনো কারণও বিদ্যমান নেই। তাই স্ত্রীদের মোহর আদায় করা ফরজ।

আইন ও বিধানঃ বিবাহকালে মোহর পাওয়া স্ত্রীর অধিকার আর মোহর আদায় করা পুরুষের ফরজ দায়িত্ব। মোহর নগদ আদায় করা ইসলামের বিধান এবং এটাই রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের অনুশ্রিত সুন্নাহ। মোহর আদায় না করা বা মোহর নিয়ে টালবাহানা করা অনৈতিক ও অবৈধ কাজ।

উদাহরণঃ ৫ = অনুকরণ করা ফরজ। ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো অনুকরণ। ইরশাদ হচ্ছে..

আর অনুকরণ কর প্রভূ থেকে আগত ওহীর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কে অবগত। (৩৩ আহযাবঃ ২)	وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2)

পর্যালোচনাঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ থেকে আগত ওহীর অনুকরণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এ আদেশ ফরজ হবার বিপরীতে কোনো কারণও বিদ্যমান নেই। তাই আল্লাহর থেকে আগত ওহীর অনুকরণ করা ফরজ।

অনুকরণের বিধানঃ মানুষ সাধারণত ৪টি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। যথা..

- আদর্শের অনুকরণ,
- কিতাব বা বিধানের অনুকরণ,
- ব্যক্তির অনুকরণ,
- সমাজের অনুকরণ।

আমরা যেহেতু আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ্ আমাদের মালিক। তাই সকল অনুকরণের ক্ষেত্রেই আমাদেরকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ..

- আল্লাহ্ যে আদর্শের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু ওই আদর্শের-ই অনুকরণ করব। সে মতে আমাদের অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ হচ্ছে ইবরাহীম আঃর আদর্শ। আমরা অন্য সব বাদ দিয়ে শুধু-ই ইবরাহিমী আদর্শের অনুকরণ করব। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ১২৫ তম আয়াতে।
- আল্লাহ্ যে কিতাব বা বিধানের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধুই ওই কিতাব ও বিধানের অনুকরণ করব। সে মতে আমাদের অনুরকনীয় একমাত্র কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। যে কথা বলা হয়েছে উপরের আয়াতে।
- আল্লাহ্ যে ব্যক্তির অনুকরণের কথা বলবেন আমরা শুধু তার-ই অনুকরণ করব। সে মতে আমাদের আমাদের অনুকরণীয় একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাঃ। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ আ-ল ই'মরানের ৩১ তম আয়াতে।
- আল্লাহ্ যে সমাজের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধুই ওই সমাজের অনুকরণ করব। সে মতে আমাদের আমাদের অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৩৭ তম আয়াতে এবং অনেক হাদীছে।

বিঃ দ্রঃ = কখনো কখনো (امر) আদেশ সুচক শব্দ ব্যবহার করা হয় তবে এর দ্বারা আদেশকৃত বিষয় উদ্দেশ্য থাকে না। রবং বিষয়টির সাথে সংযুক্ত বিষয়টি উদ্দেশ্য থাকে তাই আদেশকৃত মূল বিষয় ফরজ না হয়ে সংযুক্ত বিষয়টি ফরজ হয়। যেমন সূরাহ নিসার ২৫ তম আয়াতে বলা হয়েছে..

তোমরা তাদেরকে (দাসীদেরকে) বিয়ে করো তাদের যথাযত কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে।	فانكحوهن باذن اهلهن

এখানে (অন্যের) দাসীকে বিয়ে করার কথা বুঝাতে আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবুও দাসীকে বিয়ে করা ফরজ নয় বরং অনুমোদিত বা বৈধ কাজ। তবে আদেশের সাথে দাসীর যথাযত কর্তৃপক্ষের অনুমতির শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে আর এটা-ই এখানকার মূল লক্ষ্য। তাই দাসীকে বিয়ে করা ফরজ না হলেও দাসীকে বিয়ে করতে হলে তার মালিকের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ মালিকের অনুমতি না নিলে দাসীকে বিয়ে করা বৈধ হবে না।

বিঃ দ্রঃ = উপরে ১ম অনুচ্ছেদের আলোচনা এবং বেশ কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম আল-কুরআনে আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করে কী ভাবে আমাদের উপর কোনো কাজকে ফরজ করা হয়। এবার ২য় অনুচ্ছেদ থেকে আমরা জানবো আল-কুরআনে আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিষয়টি ফরজ না হয়ে কী ভাবে মুস্তাবাহ হয়ে যায়।

২য় পরিচ্ছেদঃ মুস্তাহাব

মুস্তাহাব অর্থ পছন্দনীয় কাজ। যে কাজ ফরজ নয় এবং প্রতিষ্ঠিত সুন্নতও নয় এমন কাজকে ফিক্বহী পরিভাষায় বলা হয় মুস্তাহাব।

আল-কুরআনের আদেশসূচক (امر) শব্দ কখনো কখনো ঐচ্ছিক কাজ তথা সুন্নত বা মুস্তাহাব অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল-কুরআনে যেসব বিষয়ে আদেশ সূচক শব্দ (امر) ব্যবহৃত হবে কিন্তু অন্য আয়াত বা হাদীছসহ নানা কারণে বুঝা যাবে যে এ শব্দ দ্বারা আদেশ দেওয়া হয়নি বরং কল্যাণকর কাজ হিসেবে এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে তখন এমন শব্দকে মুস্তাহাব অর্থে নেওয়া হয়। যেমন..

উদাহরণঃ ১. রাতের নফল ইবাদাত। রাতে নফল ইবাদাতের কথা কুরআনে বলা হয়েছে এবং এজন্য আদেশ সূচক শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তথাপি বিষয়টি ফরজ তথা আবশ্যকীয় হয়নি বরং মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

রাতের কিছু অংশে আল্লাহকে সাজিদাহ কর আর আল্লাহর তাসবীহ কর রাতের দীর্ঘ সময়ে (৭৬/২৬)	وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26)

পর্যালোচনাঃ উপরের আয়াতে দুটি আদেশ দেয়া হয়েছেঃ রাতের কিছু অংশে আল্লাহকে সাজিদাহ করার আর দীর্ঘ সময় আল্লাহর তাসবীহ করার জন্য। কিন্তু ফিকহী বিধান মতে উভয় কাজই মুস্তাহাব। কারণ এ আদেশের বিপরীতে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79)

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কর (তথা ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ইবাদাত কর) এটা তোমার জন্য নফল (তথা ঐচ্ছিক আমল।) আশা করতে পারো প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন। (তাহাজ্জুদ অর্থ জেগে উঠা। রাতে ঘুম থেকে জেগে সালাত আদায় করাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়) (১৭ ইসরা/বানী-ইসরাঈলঃ ৭৯)

রাসূল সাঃর বাস্তব আমল থেকেও বুঝা যায় এ আয়াতের আদেশ সূচক শব্দ ফরজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি বরং মুস্তাহাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

উদাহরণঃ ২. স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর বিদায়কালে কিছু উপহার দেওয়া একটি ঐচ্ছিক উত্তম কাজ তথা মুস্তাহাব কাজ। তবে এ জন্যও আল-কুরআনে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তথাপি বিষয়টি ফরজ না হয়ে মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক ভালো কাজ হিসেবে গণ্য হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)

মুঅমিনগণ! তোমরা যদি কোনো মুঅমিনাহ নারীকে বিয়ে কর এবং স্পর্শ করার আগেই তাকে তালাক দিয়ে দেও তবে তাকে ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে না। আর (বিদায় কালে) তাকে কিছু মাতা' (উপহার) দিবে এবং সুন্দর ভাবে বিদায় করবে। (৩৩ আহযাবঃ ৪৯)

আইন ও বিধানঃ বিয়ে করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেও বিয়ে ভঙ্গ করা যায় এবং তখন তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। স্পর্শ করার আগে তালাক দিলে ওই নারীকে ইদ্দত পালন করতে হয় না। তালাকের পর ওই নারী চাইলে ততক্ষণাৎ অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। স্পর্শ করার আগে স্ত্রীকে তালাক দিলে নির্ধারিত মোহরের অর্দ্ধেক দিতে হয়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে "তালাকের পর স্ত্রীকে বিদায় দেবার সময়ে কিছু উপহার দিয়ে বিদায় করতে"। তবে এখানে আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহৃত হলেও উপহার দেওয়া দেয়া উত্তম বা মুস্তাহাব। কারণ আল-কুরআন, সাহীহ সুন্নাহ এবং রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের আমল থেকে বুঝা যায় যে উপহার দেওয়া ফরজ নয় বরং মুস্তাহাব।

পর্যালোচনাঃ উক্ত আয়াতে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছেঃ স্পর্শ করার আগে নববিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দিলে বিদায়কালে তাকে মাতা' (উপহার) দিতে হবে। এখানে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হলেও ফিকহী বিধান মতে মাতা' দেওয়া ফরজ নয় বরং মুস্তাহাব। কারণ রাসূল সাঃর সময়ে আয়াতটি এভাবেই অনুশীলন করা হয়েছে এবং এটাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পালন করা হয়নি। তাই বুঝা যায় কল্যাণকর কাজ হিসেবে উৎসাহিত করার জন্য এখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

উদাহরণঃ ৩. একজন পুরুষের জন্য একই সাথে চারজন্য স্ত্রী রাখা বৈধ তবে ফরজ নয়। যদিও এ বিষয়ে বিধান দিতে গিয়ে আল-কুরআনে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

..তোমরা বিবাহ কর দুইদুই, তিনতিন এবং চারচার জন করে নারীদের। আর (স্ত্রীদের মাঝে) সমতা বজায় রাখার ব্যাপারে শংকিত হলে এক স্ত্রী অথবা অধীনস্থ দাসী (নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।) এটা হলো অবিচার থেকে বেঁচে থাকার উত্তম পন্থা। (৪/৩)	فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

পর্যালোচনাঃ এখানে দুইদুই, তিনতিন এবং চারচার জন করে নারীকে বিয়ে করতে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তথাপিও দুই, তিন বা চারটি বিয়ে করা ফরজ নয় বরং আল্লাহর অনুমোদনকৃত বৈধ কাজ। কারণ রাসূল সাঃর কার্যকলাপ এবং সাহাবাদের বাস্তব আমল থেকে এটাই বুঝা যায়।

আইন ও বিধানঃ একজন পুরুষের জন্য এক সাথে চারজন স্ত্রী রাখা বৈধ। পুরুষকে এ অধিকার দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়া'লা। ইসলামী বিধান মতে ২য়, ৩য় বা ৪র্থ বিয়ে করার জন্য ১ম স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয় (তবে বাংলাদেশের সরকারী আইনে এটা বাধ্যতামূলক।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ একজন পুরুষের জন্য ৪ জন স্ত্রী রাখার বৈধতা দিয়ে যে বিধান দেয়া হয়েছে এটা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধান। তাই মুঅমিন হতে হলে বা মুঅমিন থাকতে হলে বিধানটিকে অবশ্যই নীতিগত ভাবে মেনে নিতে হবে। আল্লাহর এ বিধানকে অমান্য করলে বা মানতে অস্বীকার করলে বা প্রত্যাখ্যান করলে বা অবজ্ঞা করলে অথবা অপছন্দ করলে কুফর হবে। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

একটি প্রপাগান্ডা ও এর সমাধানঃ আজকাল পশ্চিমা সভ্যতার নামে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার এবং ইসলামে ত্রুটি অন্বেষণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইসলামের সুন্দর বিষয়গুলোকেও অসুন্দর বানিয়ে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এরমধ্যে একটি হল একজন পুরুষের জন্য ৪টি বিয়ের বিষয়। বিষয়টির উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয় এতে নাকি নারী অধিকার খর্ব করা হয়?!

মজার কথা হল যারা এ অভিযোগ উত্থাপন করেন তারাই আবার গার্লস ফ্রেন্ডস বা যৌন সঙ্গিনী রাখার নীতিকে সমর্থন করে বলেন "এটি হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীপুরুষের পছন্দের স্বাধীনতা বা স্বাধীন মনমানসিকতার বহিঃপ্রকাশ"। তারা একজন পুরুষের জন্য একই সাথে একাধিক গার্লস ফ্রেন্ডস বা যৌন সঙ্গিনী রাখার নীতিকে সমর্থন করে আসলে মেনেই নিয়েছেন যে একজন পুরুষের জীবনে একাধিন নারীসঙ্গ প্রয়োজন হতে পারে অথবা ভালোবাসার কারণে এমনটি হতে পারে।

আসলে বিষয়টি এমনই। জীবনের তাগিদে বা নানা কারণে কখনো কখনো একজন পুরুষের জন্য একাধিক নারীকে সেল্টার বা সঙ্গ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক। আর এসব কারণেই পশ্চিমারা গার্লস ফ্রেন্ডস নীতি প্রণয়ন করেছে আর ইসলাম দিয়েছে ৪ বিয়ের নীতি।

এখন বিবেচ্য বিষয় হল কোন নীতিতে নারী অধিকার খর্ব হয় আর কোন নীতিতে নারী অধিকার সংরক্ষিত হয়? আসুন! বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক..

ইসলামী ৪ বিয়ের নীতির মূল বিষয় হল কোনো পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গ চাইলে..

- প্রথমে তাকে বিয়ে করতে হয়
- সামাজিক অধিকার দিতে হয়
- তার দায়ভার কাঁধে তুলে নিতে হয়
- তাকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হয়
- তাকে মোহর দিতে হয়
- তার থাকা খাওয়াসহ ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয়
- ইচ্ছে হলেও তাকে ছুড়ে ফেলা যায় না বরং বিবাহ ভঙ্গের জন্য এক নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা নীতিতে গার্লস ফ্রেন্ডস বা যৌন সঙ্গী বানালে..

- তাকে বিয়ে করতে হয় না
- সামাজিক অধিকার দিতে হয় না
- তার কোনো দায় দায়ভার নিতে হয় না
- তাকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হয় না
- তাকে মোহর বা আর্থিক সাপোর্ট দিতে হয় না
- তার থাকা খাওয়া সহ ভরণপোষণের কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না।
- আর কিছুদিন ভোগ করার পর ইচ্ছে হলেই তাকে ছুড়ে ফেলা যায়, এ জন্য কোনো নিয়ম নীতি মানতে হয় না।

সুতরাং আশা করি অতি সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারবে কোন নীতি উত্তম আর নারী অধিকারের সংরক্ষক? চার বিয়ে, না কী গার্লস ফ্রেন্ডস নীতি?

৩য় পরিচ্ছেদঃ অনুমোদন বা মুবাহ

আল-কুরআনের আদেশসূচক শব্দ এলেই বিষয়টি ফরজ হয়ে যায় না বরং মাঝে মাঝে অনুমোদন হিসেবেও এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন..

উদাহরণঃ ১ = হাজ্জ বা উমরার ইহ'রাম থেকে হালাল হবার পর শিকার করা।

..যখন তোমরা (হাজ্জ বা উমরার ইহরাম থেকে) হালাল হয়ে যাবে তখন শিকার করো.. (মাইদাহঃ ২)	وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ

পর্যালোচনাঃ উক্ত আয়াতে শিকার করতে আদেশ দেয়া হয়েছে অথচ শিকার করা ফরজ, সুন্নত, মুস্তাহাব কিছুই নয় বরং অনুমোদিত কাজ।

কারণঃ যেহেতু (সূরাহ মাইদাহর ৯৫ তম আয়াত দ্বারা) ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে অবৈধ করা হয়েছিল তাই ইহরাম থেকে হালাল হবার পর শিকারের অনুমোদন দিয়েই এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এজন্য আদেশসূচক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং যারা কুরআন পড়েন, কুরআন বুঝার এবং কুরআন মত জীবন গঠনের চেষ্টা করেন তাদের জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন। আল-কুরআনের আদশ সূচক ( ) শব্দ সমূহের মাঝে..

- কোন শব্দটি ফরজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে,
- কোন শব্দটি মুস্তাহাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে
- আর কোন শব্দটি অনুমোদন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে

এসব বিষয় জানতে হবে এবং বুঝতে হবে আর এসব বিষয় জানার ও বুঝার জন্য প্রয়োজন ইসলামী শারীয়া'হর মূলনীতি সম্পর্কে যথাযত জ্ঞান অর্জন করা।

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ ধমক

কখনো কখনো আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করে কোনো বিধান দেওয়া হয় না বরং ধমক দেওয়া হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

তোমাদের যা খুশী তাই কর। (তবে মনে রেখো!) তোমরা যা করছ তিনি সব প্রত্যক্ষ করছেন। (৪১ ফুসসিলাতঃ ৪০) এখানে বিধান নয়, ধমক দেওয়া হয়েছে	اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

৫ম পরিচ্ছেদঃ চ্যালেঞ্জ

কখনো কখনো আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করে কোনো বিধান দেওয়া হয় না বরং চ্যালেঞ্জ করা হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

এর মত একটি সূরাহ বানিয়ে আনো, (আল্লাহ ছাড়া আরো খোদা আছে, এ বিশ্বাসে) তোমরা যদি সত্য হয়ে থাকো তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সমস্ত শুহাদাকেও (মনগড়া খোদাদেরকে ও) ডেকে আনো (আর সবাই মিলে একটি সূরাহ তৈরি কর – ২ বাক্বারাহঃ ২৩) এখানে বিধান নয়, চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।	فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৩য় অনুচ্ছেদঃ নিষেধ (নাহি)

নিষেধকে আরবীতে বলা হয় "নাহি"। নিষেধ আসলে আদেশের মতই। আদেশ হল ইতিবাদন আর নিষেধ হল নেতিবেচক। তাই নিষেধের বিধান আদেশের মতই।

আল-কুরআনের আদেশ সূচক শব্দ দ্বারা যেভাবে ফরজ, মুস্তাহাব বা অনুমোদন প্রমাণিত হয় নিষেধ সূচক শব্দ দ্বারাও ঠিক তেমনি হারাম, মাকরুহ বা না করা উত্তম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আর এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে এই অনুচ্ছেদকেও আমরা ৩টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্থ করেছি। যথা..

১ম পরিচ্ছেদঃ হারাম

২য় পরিচ্ছেদঃ মাকরুহ তাহরিমী (বৈধ তবে ভাল নয়, তাই না করা উচিত)

৩য় পরিচ্ছেদঃ মাকরুহ তানযিহী (বৈধ এবং ভাল তবে উত্তম নয়)

১ম পরিচ্ছেদঃ হারাম

আল-কুরআনের আদেশসূচক শব্দ দ্বারা যা বুঝানো হয় নিষেধসূচক শব্দ দ্বারা এর বিপরীত বুঝানো হয়। যেমন..

- আল-কুরআনের **আদেশ** সূচক শব্দ দ্বারা **ফরজ** বুঝানো হয় পক্ষান্তরে নিষেধ সূচক শব্দ দ্বারা **হারাম** বুঝানো হয়
- আল-কুরআনের আদেশ সূচক শব্দ দ্বারা মুস্তাহাব বুঝানো হয় পক্ষান্তরে **নিষেধ** সূচক শব্দ দ্বারা মাকরুহ বুঝানো হয়
- আল-কুরআনের আদেশসূচক শব্দ দ্বারা অনুমোদন বা শিষ্ঠাচার বুঝানো আর নিষেধসূচক শব্দ দ্বারা অভদ্রতা বুঝানো হয়।

আল-কুরআনের অনেক আয়াতে নিষেধসূচক শব্দ দিয়ে হারাম বুঝানো হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন..

উদাহরণঃ ১ = অন্যায় ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করতে নিষেধ করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে..

তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করো না এবং জেনে বুঝে (কারো সম্পদ) শাসকদের হাতে তুলে দিও না। এতে একদল লোক অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষনের সুযোগ পেয়ে যায়। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৮)	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

আইন ও বিধানঃ অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষন করা হারাম। মিথ্যা মামলা দিয়ে কিছু মানুষকে অন্যের সম্পদ ভক্ষনের সুযোগ করে দেওয়াও হারাম।

পর্যালোচনাঃ উক্ত আয়াতে অন্যায় ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে নিষেধ সূচক শব্দ ( ) ব্যবহার করা হয়েছে যা সাধারণ ভাবে কোনো কিছুকে হারাম করতে ব্যবহৃত হয়। এবং এই নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে ইহাকে শিথিল করার মত অন্য কিছু পাওয়া যায়নি তাই ইহা হারাম। মানে অন্যায় ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা এবং কারো উপর মিথ্যা মামলা দিয়ে সরকারী আমলা অথবা পুলিশ, উকিল, বিচারকসহ অন্যান্য লোকদের জন্য মানুষের সম্পদ ভক্ষণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়াও হারাম।

উদাহরণঃ ২. সূদ খাওয়া হারাম। সূদ খেতে নিষেধ করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে..

ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা সূদ গ্রহণ করো না যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৩০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

উদাহরণঃ ৩. মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীসহবাস হারাম। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তবে মসজিদে ই'তিকাফ রত অবস্থায় স্ত্রীগমন করবে না। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৭)	وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

উদাহরণঃ ৪. কোনো মুঅমিনকে নিয়ে উপহাস করা হারাম। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

মুঅমিনগণ! তোমরা একদল অন্যদলকে নিয়ে উপহাস করো না। হতে পারে তারা (যাদেরকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে) এদের (উপহাস কারীদের) চেয়ে উত্তম। নারীগণও অন্য নারীকে নিয়ে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করবে না, পরস্পরকে মন্দ নামে ডাকবে না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নামে ডাকা খুবই গর্হিত কাজ। যারা ফিরে এল না তারা পাপিষ্ঠ। (৪৯/১১)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)

পর্যালোচনাঃ উক্ত আয়াতে ৩টি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যথা..

- কেউ কাউকে নিয়ে ঠাট্টা মশকারা ব্যঙ্গ বা উপহাস করবে না।
- কেউ কারো নিন্দা করবে না।
- কেউ কাউকে মন্দ নামে ডাকবে না।
- এসব আল-কুরআনের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এবং এসব বিষয় হারাম হতে কোনো প্রতিবন্ধক দলীলও নেই তাই এসব কাজ আল্লাহ্ প্রদত্ব নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ।

উদাহরণঃ ৫. উম্মতের মাঝে বিবাদ, বিভাজন ও বিভক্তি সৃষ্টি করা হারাম। এব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো আর (দ্বীনের পথে ঐক্যবদ্ধ থাকো) পরস্পরে বিবাদ করো না, এতে তোমরা ভীত হয়ে যাবে, তোমাদের বাতাস বেরিয়ে (শক্তি নিঃশেষ হয়ে) যাবে। আর (এজন্য) সবর করো (আল্লাহর পথে অটল ও অবিচল থাক।) আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা সবর করে (তথা তার পথে অটল ও অবিচল থাকে।) (৮ আনফালঃ ৪৬)	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে দুইটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি আদেশ আর একটি নিষেধ। যথা..

- আনুগত্য করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য ছাড়া ইসলাম হয় না। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হয় ঐক্যবদ্ধ ভাবে। ইসলামী বিধান মতে আল্লাহ্, রাসূল এবং (শর্তসাপেক্ষে) কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য করা ফরজ।
- বিবাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজে বিবাদ ও বিভাজন তৈরি করে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাল সে আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল। বিবাদ ও বিভাজন জাতিকে ভীত বানায়, জাতীয় শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। যার প্রমান আজ আমরাই। ইসলামী বিধান মতে মুসলিম সমাজে বিবাদ ও বিভাজন তৈরি করে জাতিকে বিভক্ত ক্রা হারাম।

আমাদের আহবানঃ তাই মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি উদাত্ব আহ্বান পরস্পরে বিবাদ ত্যাগ করুন, দলবাজি ছেড়ে দিন। মনে রাখবেনঃ কিছু মানুষ তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করছে। মনগড়া মসলক, মিনহজ ও আক্বীদার দোহাই তুলে পরস্পরে দ্বন্দ লাগিয়ে শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। আসলে আমরা সবাই মুসলিম, একই নবীর উম্মত, একই শারীয়া'হর অনুসারী। ইসলাম দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ দিয়েছে, এটা ইসলামের উদারতা। তাই ভিন্ন ফিক্বহ মেনে চললেও জাতি হিসাবে আমরা এক। দলীল ভিত্তিক সকল মতামত মেনে নিয়ে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে হবে। নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে, জাতি হিসাবে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাব।

উদাহরণঃ ৫. যারা উম্মতের মাঝে বিবাদ, বিভাজন ও বিভক্তি সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা সমর্থন করা হারাম। এব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তোমরা তাদের মত হইও না! যারা পরস্পরে বিরোধ করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান (আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্বেও যারা দলাদলি করেছে এবং করবে) তাদের তরে মহা আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৫)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে তাদের সঙ্গ দিতে এবং সমর্থন করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা পরস্পরে বিরোধ করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাই ইসলামী বিধান মতে বিবাদ, বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি যেমন নিষিদ্ধ ঠিন তেনি ভাবে যারা এসব জঘন্য কাজ করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ, হারাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও দলবাজি, দলাদলি ও ভিন্ন পথ সম্পূর্ন ভাবে নিষিদ্ধ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। দলবাজদের সঙ্গ দেয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত আর ভিন্ন পথ এক নয়। দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত ইসলামে অনুমোদিত। তবে এই ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেললে ইহা দলাদলি বা দলবাজিতে পরিণত হয়।

২য় পরিচ্ছেদঃ মাকরুহ

মাকরূহ আসলে অবৈধ নয়, মাকরূহ কাজ করলে পাপ হয় না তবে করা উচিত নয় বা ভালো নয়। এমন অর্থ বুঝাতেও আল-কুরআনে "নাহী" তথা নিষেধ সুচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102)

পটভূমিঃ মানুষের জীবনে এমন অনেক বিষয় থাকে যেসব বিষয় না জানাই কল্যাণকর। এমন বিষয় জানার চেষ্টা করা বা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা মাঝে মাঝে সমস্যা তৈরি করে এবং মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। কিন্তু এমন করা অনেকের স্বভাব। যেমন..

আনাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীছে এসেছেঃ রাসূল সাঃ একদা বললেনঃ আমি এখানে অবস্থান করা অবস্থায় তোমরা যা প্রশ্ন করবে আমি উত্তর দেব। তখন এক ব্যক্তি বলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আমার চির আবাস কোথায়"? তিনি বললেন "জাহান্নামে"। আরেকজন বলঃ আমার বাপ কে? রাসূল সাঃ বললেনঃ অমুক। (কুরতুবীঃ বুখারী, মুসলিম) (রাসূল সাঃ ওই ব্যক্তির মায়ের স্বামী ছাড়া অন্যের নাম বলে ছিলেন। পরে বিষয়টি নিয়ে পরিবারে অনেক ঝামেলা হয়েছিল) এমন বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ হলে তোমরা অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। আর কুরআন নাযিলকালীন সময়ে এমন প্রশ্ন করলে সব প্রকাশ হয়ে যাবে। (তবে যা করে ফেলেছো এসব নিয়ে ভেবো না। কারণ) আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

তোমাদের আগে অনেক জাতি-ই এমন প্রশ্ন করেছে, পরে (সত্য প্রকাশ হবার পর এসব মেনে নিতে অমান্য করে) তারা কাফির হয়ে গেছে। (৫ মা-ইদাহঃ ১০১-১০২)

আইন ও বিধানঃ এমন প্রশ্ন করা হারাম নয়। তবে খুবই অপছন্দনীয় এবং নিন্দনীয় কাজ। কখনো কখনো যা মেনে নেওয়া মানুষের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সা. থেকে সত্যটা জানার পর এটা না মানলে কুফর হয়।

৩য় পরিচ্ছেদ

কখনো কখনো আদব পরিপন্থী বা শিষ্ঠাচারের বিপরীত বুঝাতেও "নাহী" তথা নিষেধ সুচক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা (কারো ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নিবে এবং সালাম করবে) অনুমতি না নিয়ে এবং ঘরবাসীকে সালাম না করে কারো ঘরে প্রবেশ করবে না। তবে নিজের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি নিতে হবে না। (তবে তখনো সালাম করা সুন্নাহ।) এটা-ই তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা, তোমরা এসব মেনে চলবে।

২৮. (কারো ঘরের দরজায় গিয়ে সালাম দেবার পর) ঘরে কাউকে না পেলে সে ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হবে। যদি বলা হয়ঃ চলে যাও, তবে চলে আসবে, তোমাদের জন্য এটা-ই উত্তম পন্থা। আর (শোনো!) তোমরা যা কর আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত।

২৯. তবে যে ঘর আবাসিক নয়, যে ঘরে তোমাদের আসবাব পত্র রাখা আছে, (বিনা অনুমতিতে) সে ঘরে প্রবেশ করা দোষের নয়। (মনে রেখো!) তোমরা যা গোপন কর আর যা প্রকাশ কর আল্লাহ সব জানেন। (২৪ সূরাহ নূরঃ ২৭-২৯)

আদব ও আখলাকঃ কারো ঘরে বা কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হয় এবং সালাম করতে হয় আর এটা হলো সামাজিক শিষ্ঠাচার। অনুমতি নেয়ার একটি মাধ্যম হতে পারে সালাম। বিনা সালামে বা বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা অন্যায়। মনে রাখবেঃ মানুষ সব সময় ভাল অবস্থায় থাকে না। তাই চলে যেতে বলা হবে চলে আসবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শুনো!) তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী/চাকর-চাকরানী আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও তিন সময়ে (তোমাদের ঘরে বা কক্ষে প্রবেশ করতে) অনুমতি নেবেঃ ফজর সালাতের আগে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা (সাধারণ) পোশাক খুলে (ঘুমের পোশাকে আরাম কর) আর ঈশা সালাতের পর। এ তিন সময় তোমাদের একান্ত সময়। অন্য সময়ে (তারা যদি বিনা অনুমতিতে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করে তবে) তোমাদের বা তাদের কোনো পাপ হবে না। (কারণ) তোমাদেরকে বারবার একে অপরের কাছে আসা যাওয়া করতে হয় (তাই সব সময় অনুমতি নেওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে।) আল্লাহ এভাবেই তার বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলেও অনুমতি নেবে যেমন আগে নিত। আল্লাহ এভাবেই তার বিধান (স্পষ্ট করে) বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। (২৪ নূরঃ ৫৮-৫৯)

৪র্থ অনুচ্ছেদঃ সংবাদ (খবর)

কখনো কখনো আদেশ বা নিষেধসূচক শব্দ ব্যবহার না করে সংবাদ বা তথ্য বর্ণনার মাধ্যমেও অনেক বিধান বর্ননা করা হয়েছে এবং অনেক কিছুকে ফরজ বা হারাম করা হয়েছে।

সংবাদের ধরনঃ আল-কুরআনে উল্লেখিত সংবাদ আবার সাধারনত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা..

- সরাসরি আমাদেরকে দেয়া সংবাদ
- বানী-ইসরাঈলের বা অন্যান্ন জাতির সংবাদ

আমাদেরকে দেওয়া সংবাদঃ আল-কুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যাতে আদেশ বা নিষেধের বদলে সংবাদের মাধ্যমে কোনো কিছুকে ফরজ বা হারাম করা হয়েছে। যেমন..

উদাহরণঃ ১. মুসলিমদের জন্য রোজা রাখা ফরজ। এবং এ ফরজ হবার বিধান দেয়া হয়েছে সংবাদের মাধ্যমে। এব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পুর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন কর। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে) (২ বাক্বারাহঃ ১৮৩)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে সিয়াম সাধন তথা রোজা পালন করাকে ফরজ করা হয়েছে। তবে আদেশের মাধ্যমে নয়, সংবাদের মাধ্যমে।

উদাহরণঃ ২. ক্বিতাল বা যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর ফরজ। এ ফরজ হবার বিধান অনেক ভাবেই দেওয়া হয়েছে। যার একটি হচ্ছে সংবাদের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে ক্বিতাল (যুদ্ধ) অথচ এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। অনেক কিছুই তোমরা পছন্দ কর না কিন্তু ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অনেক কিছুই তোমরা পছন্দ কর কিন্তু ইহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আসলে আল্লাহই ভালো জানেন, তোমরা জান না। (২ বাক্বারাহঃ ২১৬)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে যুদ্ধকে ফরজ করা হয়েছে। তবে আদেশের মাধ্যমে নয়, (জুমলাহ খাবারিয়্যাহ ব্যবহার করে) খবরের মাধ্যমে। যুদ্ধ করা মুসলমানদের উপর ফরজ। যুদ্ধকে অস্বীকার করার বা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। বরং

- যে মুসলিম যুদ্ধকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করল সে কুফর করল। তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে ঈমানশূন্য মুনাফিক।
- যে মুসলিম যুদ্ধকে অপছন্দ করল সেও মুনাফিক হয়ে গেল।
- যে মুসলিম যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেল বা পালিয়ে থাকল সে হয়ে গেল চির জাহান্নামী। (দেখুনঃ ৮ আনফালঃ ১৬)
- হাদীছে বর্নিত ধ্বংসাত্বক ৭টি মহাপাপের একটি হচ্ছে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

উদাহরণঃ ৩. ফৌজদারী মামলার বিচারে ক্বিস্বাস্ব এর বিধান মেনে চলা ফরজ। এ ফরজ হবার বিধান দেয়া হয়েছে সংবাদের মাধ্যমে। এব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

মুঅমিনগণ! তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে হত্যার (বিচারে) ক্বিসাস। আজাদের বদলে আজাদ, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী (তথা জীবনের বদলে জীবন।) তবে হত্যাকারী তার ভাই (নিহতের ওয়ালী) থেকে মাফ পেয়ে গেলে আইনগত ভাবে ইহা মেনে নেয়া হবে এবং (মাফের শর্ত সমূহ) সুন্দর ভাবে পূর্ন করতে হবে। সাজা লাঘবের এই সুযোগ তোমাদের প্রতি প্রভূর বিশেষ দয়া। এতদসত্বেও কেউ সীমা লঙ্ঘন করলে তার তরে কঠিন আযাব। হে বিজ্ঞ লোকেরা! ক্বিসাসেই তোমাদের জীবন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে (পাপ থেকে বেঁচে থাকতে) পার। (২ বাক্বারাহঃ ১৭৮-১৭৯)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে ক্বিস্বাস্ব ফরজ করা হয়েছে। তবে আদেশের মাধ্যমে নয়, (জুমলাহ খাবারিয়্যাহ ব্যবহার করে) খবরের মাধ্যমে। ফৌজদারী মামলার বিচারে ক্বিস্বাস্বের বিধান মেনে চলা মুসলমানদের ফরজ দায়িত্ব। এই বিধান মানতে অস্বীকার কারলে বা ইহাকে অবজ্ঞা করলে কুফর হয়। তাই কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে ঈমানশূন্য মুনাফিক।

আইন ও বিধানঃ ক্বিসাস মানে সমতা বজায় রেখে বদলা নেয়া। যেমন..

- খুনের বদলে খুন, চড়ের বদলে চড়, লাথির বদলে লাথি, এই তো ক্বিসাস।
- ক্বিসাস মাফও করা যায়।

- ক্বিসাস মাফের ক্ষমতা ও অধিকার থাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ালীর (অভিভাবকের।) নিহত ব্যক্তির ওয়ালী ছাড়া অন্য কেউ (সরকার প্রধান বা আদালত) ক্বিসাস মাফ করতে পারে না।
- নিহত ব্যক্তির কোনো একজন ওয়ালীও মাফ করে দিলে ক্বিসাস মাফ হয়ে যায়। তখন আদালত চাইলে ক্বিসাস ছাড়া অন্য সাজা দিতে পারবে।
- খুনী ব্যক্তি নিহতের পরিবার থেকে চুক্তি ভিত্তিক মাফও নিতে পারবে। এই মাফের বিনিময়ে দেয়া অর্থ বা সম্পদকে দিয়াত বলে। দিয়াত যথাযত ভাবে আদায় করতে হয়।
- হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র ও ইসলামী সরকার দিয়ত আদায়ে হত্যাকারীকে সাহায্য করবে।
- ক্বিসাস মাফের সুযোগ আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দয়া। আগেকার শারীয়া'হ মতে ক্বিসাস মাফের সুযোগ ছিল না।

উদাহরণঃ ৪. মানুষের সাথে ইহসান তথা সুন্দর ব্যবহার করা ও সদাচার করা ফরজ। এটা ফরজ হবার বিধান দেয়া হয়েছে সংবাদের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)	

আমি (আল্লাহ্) বানী-ইসরাঈল থেকে (কয়েকটি বিষয়ে) অঙ্গিকার নিয়েছিলাম। (বিষয়গুলো হল...)

- তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব করবে না,
- বাবা-মা আত্মীয়স্বজন ও এতীম মিসকিনের (তথা সকলের) সাথে ইহসান (সুন্দর আচরণ) করবে
- মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলবে,
- সালাত কায়েম করবে,
- যাকাত আদায় করবে।

এতদ সত্বেও তোমরা অল্প কজন ছাড়া বাকি সবাই (আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরে) ফিরে গিয়েছ, তোমরা (আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (২ বাক্বারাহঃ ৮৩)

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ্ সকল বান্দা থেকেই এসব অঙ্গীকার নিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করার মানেই হচ্ছে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়া। তাই এসব অঙ্গীকার আমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমাদেরকেও এসব অঙ্গীকার পুরন করতে হবে। আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ইহা পুরন না করা মহাপাপ আর ইহাকে অবজ্ঞা করা বা ইহা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কুফর।

উদাহরণঃ ৫. হারামঃ সূদ হারাম এবং এ হারামের বিধানটি নানাভাবে দেওয়া হয়েছে। এর একটি হচ্ছে সংবাদ। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	..আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, সূদকে করেছেন হারাম।.. (বাক্বারাহঃ ২৭৫)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে আদেশ বা নিষেধ সূচক কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি বরং সূদ হারাম বলে সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং এ সংবাদের মাধ্যমে আমাদেরকে এ বিধান বুঝানো হয়েছে।

বানী-ইসরাঈল বা অন্যান্য জাতীর সংবাদঃ আল-কুরআন কয়েকটি কারনে আমাদেরকে বানী-ইসরাঈল বা অন্যান্য জাতীর সংবাদ দিয়ে থাকে। যেমন..

কারনঃ ১. সমান বিধান আমাদের জন্যও প্রযোজ্যঃ আল-কুরআন আলাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ন, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে অন্যান্য জাতির কাছে আগত বিধানসমূহও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তাই আল-কুরআন যদি অন্য কোনো জাতির কাছে আগত কোন বিধানের ব্যাপারে সংবাদ দেয় আর এ বিধান ওই জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ না করে তবে এ বিধানটি আমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)

আমরা তাওরাতে তাদের জন্য লিখে দিয়েছিলাম জানের বদলে জান, চুখের বদলে চুখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত তথা প্রতিটি আঘাতের (বদলে আঘাত আর এটাই) **ক্বিসাস** (তথা সমতা বজায় রেখে বিচার। তবে বাদি পক্ষের) কেউ ক্বিস্বাস্ব মাফ করে দিলে, এটা তার (বিবাদীর) জন্য কাফফারাহ (মাফের উসিলা) হয়ে যাবে। আর যে (বা যারা শাসক, প্রশাসক, বিচারক, আদেশদাতা, আইন প্রনেতা বা পরিচালক হয়েও) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ জারি ও আইন প্রণয়ন) করে না তারা (সে ও তার অনুসারীরা সবাই) জালিম (মুশরিক হয়ে যায় এবং এতে আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ তথা কর্তৃত্বে শিরক হয়।) (৫ মা-ইদাহঃ ৪৫)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য বিধান মেনে বিচার বা শাসন করলে শিরক হয়। কারণ এতে অন্যকে (তথা যার বানানো আইন মত বিচার ও শাসন করা হয়েছে তাকে) বিধান দাতা হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এবং এতে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও হাকিমিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে ও কর্তৃত্বে শিরক হয়, যা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় মুনাফিক।

আইন ও বিধানঃ ইসলামী দন্ডবিধির মৌলিক একটি বিধান হচ্ছে ক্বিসাস। ক্বিসাস ন্যায় ও সাম্যের মানদণ্ড। অপরাধী সে যেই হক, যত বড় হক বা যতই প্রভাবশালী হক, সকলেই ক্বিসাসের আওতাধীন। রাজা, বাদশা বা প্রেসিডেন্ট কারো ক্ষমতা নেই ক্বিসাস মাফ করার। ক্বিসাস মাফ করতে পারবে একমাত্র নিহতের ওয়ালী।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে বানী-ইসরাঈলেরকাছে আগত তাওরাতের একটি বিধানের তথা ক্বিস্বাস্বের ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু বিধানটি তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, তাই বিধানটি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে কোনো বিধানের কথা বর্ননা করার পর আল-কুরআন যদি এটাকে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে তবে এ বিধান আমাদের জন্য প্রযোজ্য হয় না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94)

সূত্রঃ উটের মাংস সর্বদা-ই সুখাদ্য হিসেবে পরিচিত। মানব ইতিহাসে উট সর্বদা-ই হালাল ছিল। শুধু ইয়াকুব আঃ মান্নত করে উট খাওয়া বর্জন করেছিলেন। তিনি বাত রোগে আক্রান্ত হয়ে শপথ করেছিলেনঃ আল্লাহ সুস্থতা দান করলে (সবচেয়ে প্রিয় খাবার) উঠের মাংস বর্জন করবেন। সুস্থ হবার পর তিনি উট বর্জন করে ছিলেন। কারণ উট ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। তার দেখাদেখি তার সন্তানরাও উটের মাংস বর্জন করতে শুরু করে।
আল্লাহর দেয়া একটি সুখাদ্যকে এভাবে বর্জন করা আল্লাহর পছন্দ হল না। তাই তাদের সাজা স্বরূপ তাওরাতে এটাকে হারাম করা হয়। এসব ঘটনা ছিল ইবরাহীম আঃর পরে। এর সাথে ইবরাহীম আঃ বা তার আদর্শের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তথাপিও ব্যাপারটিকে ইবরাহীম আঃর সাথে সম্পৃক্ত করে এটাকে ইবরাহীমের আদর্শ হিসেবে প্রচার করত ইয়াহুদ উলামা সমাজ। তারা বলতঃ ইবরাহীম এটা হারাম করেছেন।

পটভূমিঃ একদা কতিপয় ইয়াহুদ নবী সাঃকে বললঃ আপনি বলছেন আপনি ইবরাহীমের আদর্শ মেনে চলেন। (আবার আপনি উটের মাংস খাচ্ছেন) অথচ ইবরাহীম উটের মাংস খেতেন না। (কারণ আল্লাহ এটা হারাম করেছেন।) তাদের এমন মিথ্যা দাবীকে খন্ডন করে নাযিল হয়ঃ (জালালাইন)

তাওরাত নাযিলের আগে সকল প্রকার (হালাল) খাবার-ই বনী-ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, তবে শুধু ইসরাঈল (মান্নত করে) একটি খাবার (উট) নিজের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। (হে নবী! তাদেরকে) বলো! (তোমরা বলছ আল্লাহ্ এটা হারাম করেছেন।) তাওরাত আনো এবং পাঠ কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (এটা-ই হল আসল ঘটনা) এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে তারা পাপিষ্ঠ। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৯৩-৯৪)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ আমাদের রাব্ব। আমাদের জন্য বৈধ-অবৈধ, করনীয়-বর্জনীয়, হালাম-হারাম নির্ধারনের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ। আল্লাহর নির্ধারিত কোনো হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। এমন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। উল্লেখ্য আজকাল আমাদের সমাজে দুই ধরণের হারাম পরিলক্ষিত হয়। যথাঃ মানসূস হারাম ও মুজতাহাদ হারাম।

মানসূস হারামঃ যে হারামের কথা কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীছে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে এটা হল মানসূস হারাম। যেমনঃ মৃত পশুপাখি, শূকরের মাংস এবং প্রবাহমান রক্ত। এসব বস্তু হারাম হওয়ার কথা আল-কুরআনে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানসূস হারামকে হালাল বা মানসূস হালালকে হারাম মনে করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

মুজতাহাদ হারামঃ যে হারাম কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়নি। বরং ফিক্বহী নিয়মে পড়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, এটা মুজতাহাদ হারাম। মুজাতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয়। বরং এগুলো আসলে মাকরুহ। ইসলামের প্রথম যোগে এগুলোকে মাকরুহ হিসেবে-ই মানা হত। তারপর এলো ফিক্বহ বিশ্লেষণের যোগ। তখন এগুলোকে বলা হল মাকরুহ তাহরিমী। তারপর মাকরুহ তাহরিমীকে বিশ্লেষণ করে বলা হল "হারামের কাছাকাছি"। আর বর্তমানে অতি বাড়াবাড়ি করে অনেকেই এসব বিষয়কে বলছেন হারাম আর কেউ কেউ বলছেন সাফ হারাম। যেমনঃ কচ্ছপ, ডলফিন বা কাকড়া খাওয়া। মুজতাহাদ হারামের ব্যাপারে ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক। এসব ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত গ্রহণ যোগ্য এবং এতে পাপ হয় না।

বিঃ দ্রঃ = মুজতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয়। শারীয়া'হ মতে এসব বিষয়কে হারাম বলা যায় না। ফিক্বহের পরিভাষায় এসবকে মাহরুহ (তাহরিমী) বলা হয়। কিন্তু আজকাল অনেক আলিমই এসব বিষয়কে বলে থাকেন হারাম বা সাফ হারাম।

কারনঃ ২. তাদের বিভ্রান্তি ও বদ-স্বভাব থেকে সাবধান করাঃ বানী-ইসরাঈল ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তাদের অনুসৃত সকল পথ-ই বিভ্রান্তির। কারনঃ এসব পথ ধরে তাদের সবাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাই মহা আল্লাহ আল-কুরআনে এসব কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন; যেন আমরা এসব পথ পরিহার করে চলি এবং এসবের কাছেও না যাই। যেমন তাদের বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)

(হে নবী!) তুমি কী তাদেরকে (ইয়াহুদ নাসারাদেরকে) দেখনি? যাদেরকে কিতাব (তাওরাত, যাবূর, ইনজীল) দেওয়া হয়েছিল তথাপিও তারা (আল্লাহর কিতাব ছেড়ে) বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তারা চায় তোমরাও (মুসলিমরাও আল্লাহর কিতাব ছেড়ে দিয়ে তাদের মত) সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। তোমাদের শত্রু সম্পর্কে আল্লাহ্ খুবই অবগত। ওয়ালী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট আর সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ-ই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ৪৪-৪৫)

জ্ঞাতব্যঃ হেদায়াতের একমাত্র উৎস আল্লাহর কিতাব। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলবে সে-ই হেদায়াত পাবে আর যে মানবে না সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর কিতাব-ই হচ্ছে আইন ও জ্ঞানের একমাত্র সঠিক উৎস। তবে হাঁ..,

- কোনো বিষয়ের সমাধান আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া গেলে দেখতে হবে রাসূল সাঃর সুন্নাহ বা হাদীছ
- আর হাদীছে না পাওয়া গেলে সাহাবাদের উক্তি
- এবং তাতেও না পাওয়া গেলে শর্তসাপেক্ষে ইজমা ও কিয়াস।
- এটা-ই ফিক্বহী নিয়ম এবং এটা-ই ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মাযহাবের মূল কথা।

বিভ্রান্তিঃ অনেকে এ বিষয়টিকে সঠিক ভাবে না মেনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। যেমন..

- আমাদের সমাজের অনেকেই দ্বাইফ বা মাওদ্বু' হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ান। অথচ হাদীছ কখনো কুরআনের বিপরীতে দলীল হিসেবে গণ্য হয় না।
- অনেকে আবার ইমামের মতামত বা ইজতিহাদকে হাদীছের বিপরীতে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। অথচ কোনো ইমামের উক্তি বা ইজতিহাদ কখনো সাহীহ হাদীছের বিপরীতে দলীল হতে পারে না। এবং এটা-ই সকল ইমামের ঐক্যবদ্ধ উক্তি।
- না বুঝে বা পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেকে আবার মাযহাবকে কুরআন বা হাদীছের বিপরীতে এনে হাজির করেন। অথচ মাযহাব কখনো কুরআন বা সুন্নাহর বিপরীতে দাড়াতে পারে না। বরং কুরআন এবং সুন্নাহর আনুগত্য ও অনুকরণ-ই মাযহাবের মূল কথা।

তাদের বদ-স্বভাবের কথা উল্লেখ করে নাযিলহয়েছে..

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46)

ইয়াহুদরা (আল্লাহর কিতাবের) শব্দকে **তাহরীফ** করত, তারা বলতঃ শুনলাম, (তবে) মানতে পারলাম না। (তাদের আলিমরা জনতাকে) বলত (মুহাম্মদের কথা) শোনবে না শোনার মত করে। তারা মুখ ব্যাংচিয়ে তিরস্কার করে (নবীকে) বলতঃ রাই'না।

(এমন না করে) তারা যদি বলতঃ শুনলাম আর মেনে নিলাম। (আলিমরা যদি জনতাকে বলত মানার জন্য) শুনো, (আর নবীকে বলত) লক্ষ্য করুন! তবে কত উত্তম ও কল্যাণকর হত। কিন্তু (তারা যা করছে এসবই কুফর। আর) এসব কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। ফলে ঈমান তারা কমই আনবে। (৪ নিসাঃ ৪৬)

তাহরীফ পরিচিতিঃ তাহরীফ অর্থ পরিবর্তন। আল্লাহর কালামের শব্দ, অর্থ, মর্ম বা বিধান বদলে ফেলাকে তাহরীফ বলা হয়। আল্লাহর কিতাবে তাহরীফ করা কুফর। তখনকার যোগে তাহরীফ করত ইয়াহুদ উলামা সমাজ আর আজকাল আমাদের অনেক আলিমও তাহরীফ করে থাকেন। তবে আজকাল শব্দ বদল হয় না বরং মর্ম, ভাবার্থ ও বিধান বদল করা হয়। (তাহরীফ সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন এই তাফসীরের শুরুতে তাহরীফ পাঠ)

রাঈ'না: আরবী রাঈ'না অর্থ আমাদের রাখাল, আমাদের নেতা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে হিব্রু ভাষায় "রাঈ'না" একটি গালি। ধূর্ত ইয়াহুদ আলিমগণ রাসূল সাঃকে সম্বোধন করতে "রাঈ'না" শব্দটি ব্যবহার করত। বাহ্যত তারা বুঝাত আমাদের নেতা আর মনে মনে গালি অর্থে ব্যবহার করে মজা পেত।
তাই মহান আল্লাহ্ এধরনের বহুরূপী শব্দের ব্যবহার থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন। ইসলাম স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন শিক্ষা দেয়। তাই বহুরূপী হওয়া বা হটকার হওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

তাদের মত না হওয়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করে নাযিল হয়েছে..

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

আর (হে আমার বান্দারা!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা পরস্পরে মতবিরোধ করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে (ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে) অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান (আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্বেও অতীতে যারা দলাদলি করেছে এবং তোমাদের যারা দলাদলি করবে) তাদের তরে মহা আযাব। (আ-ল ই'মরানঃ ১০৫)

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে তাদের সঙ্গ দিতে এবং সমর্থন করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা পরস্পরে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যারা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে এবং বানিয়ে ফেলছে। তাই ইসলামী বিধান মতে বিবাদ, বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি যেমন নিষিদ্ধ ঠিন তেমনিভাবে যারা এসব জঘন্য কাজ করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ, হারাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও বিভক্তি, বিভাজন, দলাদলি ও ভিন্ন পথ বানানো সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। অতীতে দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। দলবাজদের সঙ্গ দেয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ।
উল্লেখ্য দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত আর ভিন্ন পথ এক নয়। দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত ইসলামে অনুমোদিত। তবে এ ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেললে এটা দলাদলি বা দলবাজিতে পরিণত হয়। আর আজকাল অনেক ক্ষেত্রে এমন-ই করা হচ্ছে। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সুরাহ মুমিনূনঃ ৫৩ এবং এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন আমাদের বই "ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ"।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ এবং ঐক্য ভঙ্গ করা কুফরঃ এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)

আর (শুনো!) তোমরা (দুনিয়ার সকল মুসলিম) ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকবে, তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেও না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ (ইসলামী ভাতৃত্ববোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে) তোমাদের অন্তরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়ায় তোমরা এখন ভাই ভাই হয়ে গেছো। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৩)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের মূল শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য। দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একতাবদ্ধ, একই সমাজ ভুক্ত, একই নেতা ও একই শাসনের আওতাধীন। মুসলিম ঐক্যের এ একক ফর্মূলার নাম খিলাফাহ। আল্লাহর আদেশ পালন করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করে ছিলেন রাসূল সাঃ। পরে এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন সম্মানিত খালীফাহগণ।

- প্রথমে খুলাফা রাশিদীন,
- তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ,
- তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ,
- সবশেষে উছমানী খিলাফাহ।

কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খালীফাহ। তখন..

- × রাসূল সাঃর হাতে গড়া তাওহীদী সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরি সমাজ।
- × কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মানব রচিত ও মনগড়া বিধান।
- × এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি।
- × মুসলিম জাতীয়তাবাদের জাগায় চালু করা হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- × খিলাফাহর জাগা দখল করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি।
- × ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।

- ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জায়গায় চালু করা হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি। এভাবে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

- উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।
- বিভক্তি, বিভাজন বা দলাবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)
- যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। (দেখুনঃ ৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)
- আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাস্য মতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাতে বুঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

অনুচ্ছেদঃ ১২. কুরআন নাযিলের লক্ষ্য

আল-কুরআন নাযিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল-কুরআন নিজেই বর্ননা করেছে। এর মাঝে মাত্র ৩টি লক্ষ্য আমরা এখানে উল্লেখ করছি। যেমন..

লক্ষ্যঃ ১. তাদাব্বুর করাঃ আল-কুরআন নাযিলের একটি অন্যতম লক্ষ্য হল আল-কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর তথা অধ্যয়ন ও গবেষনা। অর্থাৎ আল-কুরআনে উল্লেখিত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং গবেষনার ফল হিসেবে নতুন নতুন সমস্যার সমাধানসহ (কুরআনে উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধান তৈরি করে) অন্যান্য বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আর এসব কাজকে একত্রে বলা হয় তাদাব্বুর। ইরশাদ হচ্ছে..

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)

(হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি এটা অতি বরকতময়। লোকজন যেন এর আয়াতসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে। আর এটা গ্রহণ করবে কেবল বুদ্ধিমানেরাই। (৩৮ স্বাদঃ ২৯)

তাদাব্বুর পরিচিতিঃ তাদাব্বুর হলো আল-কুরআনকে এমন ভাবে অধ্যয়ন করা যাতে এর মর্ম অনুধাবন করা যায় এবং সাধারণ মানুষের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করা যায় যেন বাস্তব জীবনে আল-কুরআন মেনে চলা তাদের জন্য সহজ হয়।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)

তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য থেকে আসত তবে এতে অনেক গরমিল পাওয়া যেত। (৪ নিসাঃ ৮২)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)

তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে না? না কি তাদের অন্তরকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? (৪৭ মুহাম্মাদঃ ২৪)

তাদাব্বুর পরিচিতিঃ তাদাব্বুর এর মূল শব্দ "দুবুর" অর্থ পিছন। ইবন আ'ত্বিয়্যাহ রাহিঃর বলেছেনঃ কোনো বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে তার শেষ পর্যন্ত (আদি অন্ত) জেনে ফেলাকে তাদাব্বুর বলে।

সে মতে কুরআন নিয়ে তাদাবুর করার অর্থ দাঁড়াবেঃ আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদি নিয়ে গভীর চিন্তা গবেষনা করে এর মর্ম উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হওয়া এবং সাধারণ মানুষের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হওয়া যেন আল-কুরআনের বিধানসমূহ বাস্তব জীবনে মেনে চলা তাদের জন্য সহজ হয়। আমাদেরকে এ পথে চলতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং আল-কুরআনের বিধান মতে জীবন পরিচালিত করতে হবে। এমন হতে পারলে আমাদের তাদাব্বুর সফল হবে, ইন শা-আল্লাহ। আর এ জন্য আমাদেরকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াদিতে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কুরআন পড়াঃ তাজওয়ীদ ও লুগা'ত সহ।	تجويد القران لغات القران	قرأة القران	1
প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝতে হবে	كلمة كلمة	معاني القران	2
আল-কুরআনের তরজমা বুঝতে হবে ৩ পদ্ধতিতে। যথা.. শব্দে শব্দে তরজমা, বাক্যে বাক্যে তরজমা ও পারিভাষিক তরজমা	ترجمة كلمة بكلمة ترجمة جملة بجملة ترجمة مفهوم بمفهوم	تراجم القران	3
আল-কুরআনের ই'রাব (গ্রামার) বুঝতে হবে		اعراب القران	4

আল-কুর আনের তাফসীর বুঝতে হবে... এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে অথবা মুতাওয়াতির হাদীছ দিয়ে। (এমন তাফসীর নির্ভর যোগ্য) সাহীহ খাবার ওয়াহিদ দিয়ে অথবা সাহীহ সনদে সাহাবাদের পরিভাষা দিয়ে অথবা সাহীহ সনদে সাহাবাদের বাণী দিয়ে। (এ ৩ প্রকার তাফসীর গ্রহণ যোগ্য) অশুদ্ধ সনদে হাদীছ বা সাহাবার বাণী দিয়ে অথবা ইসরাইলী বর্ণনা দিয়ে। (এমন তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয়) পরবর্তিদের তাফসীর দলীলের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ বা অগ্রহণ করা হবে।	**تفسير القران بالقران (هذا تفسير متيقن)** **تفسير القران بالاحاديث المتواترة (هذا ايضا متيقن)** **تفسير القران بالخبر الواحد الصحيحة (هذا معتبر)** **تفسير بعرف الصحابة بالسند الصحيح (هذا معتبر)** **تفسير بقول الصحابة بالسند الصحيح (هذا معتبر)** **تفسير بالاحاديث الغير الصحيحة (ما يعتبر عليه) وكذالك** **تفسير بعرف الصحابة او بقولهم بالسند غير الصحيح** **تفسير بالروايات اسرائليات (ما يعتبر عليه)** **تفسير من بعد الصحابة بالدليل**	**تفسير القران**	5
আল-কুরআনের প্রতিটি বিধান, প্রতিটি ঘটনা তথা প্রতিটি বিষয়কে আলাদা আলাদা করে গবেষণা করতে হবে।	**دراسات الاحكام حكما حكما** **دراسات القصص قصة قصة** **دراسات الفنون فنا فنا.....**	**دراسات القران**	6
আল-কুরআন থেকে বিধান বের করে আনতে হবে। এ ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের ইস্তিখরাজ অধ্যয়ন করতে হবে এবং নতুন বিষয়ে নিজে একা বা দলগত ভাবে ইজতিহাদ করতে হবে।	**بالدراسة من نصوص الأئمة المجتهدين في مسائل القديمة في المسئلة الجديدة (فردا و جماعة) ويجتهد برائه**	**استخراج من القران**	7
আল-কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে।	**باحكامه وقصصه واقواله كله ما يعرف و مالا يعرف**	**ايمان بالقران**	8
বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআনে বর্ণিত আইন ও বিধান মেনে চলতে হবে।		**العمل بالقران**	9

আল-কুরআনের ফজিলতঃ আল-কুরআনের ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীছ থেকে মাত্র দুটি হাদীছ উল্লেখ করা হল..

عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال **يجئ القران يوم القيامة فيقول يارب حلِّه فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يارب زده فيل بس حلة الكرامة فيقول يارب ارض عنه فيرضي عنه فيقال له اقرأ وارق وتزاد بكل اية حسنة** (رواه الترمذي (2915) وقال هذا حديث حسن صحيح وقال الالباني في صحيح الترمذي برقم (2328) حسن)

আবু-হুরাইরাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কুরআন এসে বলবেঃ হে রাব্ব! (যে আমাকে মেনে চলেছে) তাকে অলংকৃত করুন। তখন তাকে সম্মানের তাজ পড়িয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর কুরআন বলবে হে রাব্ব! তাকে আরো সম্মান দিন! তখন তাকে সম্মানের অলংকার পড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর কুরআন বলবেঃ হে রাব্ব! তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ (চিরতরে) তার প্রতি সন্তুষ্টি ঘোষণা করবেন এবং তাকে বলা হবেঃ পড়ো আর (সম্মানের উচ্চ শিখরে) আরোহণ করো এবং প্রতিটি আয়াতের বদলে একটি করে মরতবা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। (তিরমিযীঃ হাদীছটি হাসান সাহীহ)

وروا البيهقي في شعب الايمان في فضل حامل القران **اذا عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه يُشفع في عشرة من اهل بيته يوم القيامة ك لهم قد وجبت له النار** (ضعفه الالباني)

আল-কুরআনের ধারক ও বাহকের মর্যাদার ব্যাপারে বাইহাক্বী একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ আল-কুরআনের ধারক যদি তার বাস্তব জীবনে কুরআনের উপর আমল করে তথা আল-কুরআনে বর্ণিত হালাল ও হারাম মেনে চলে তখন কিয়ামতের দিন তাকে তার পরিবারের এমন ১০জন ব্যক্তির জন্য শাফায়া'ত করতে দেওয়া হবে যাদের তরে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। (কিন্তু হাদীছটি দ্বাইফ)

লক্ষ্যঃ ২. আইন, বিধান, বিচার ও শাসনঃ অর্থাত আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে যত আইন ও বিধান তৈরি করব এবং বিচার ও শাসন করব আর যখন কোনো আদেশ জারি করব; এসবই করব আল্লাহর কিতাবে বর্নিত বিধিবিধান ও নীতিমালা মেনে। এ ব্যাপারে আদেশ দিয়ে নাযিল হয়েছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)

(হে নবী!) আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব। যেন তুমি "তাহকীম" কর (আদেশ জারি কর, আইন তৈরি কর, বিচার কর, শাসন কর) আল্লাহর বাতানো বিধান মেনে। আর (সাবধান!) কোনো অপরাধীর পক্ষে ওকালতি করবে না। (কারো অপরাধ প্রমাণ হবার পর তার পক্ষে ওকালতি করা তথা তার সাফাই গাওয়া নিষিদ্ধ। (৪ নিসাঃ ১০৫)

তাহকীম ও হু'কম পরিচিতিঃ তাহকীম অর্থ হু'কম করা। আর হু'কম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হা'কিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরধারক)
- হুকম অর্থ জান ও প্রজ্ঞা। আর এ অর্থে নবিয়্যতকেও হুকম বলা হয়।

আর এসব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা অনেক জায়গায় হুকম শব্দের তরজমা করেছি "বিচার ও শাসন"। যদিও কেউ কেউ তরজমা করেছেন বিচার ও ফয়সালা।

লক্ষ্যঃ ৩. কুরআন মত জীবন পরিচালনাঃ কুরআন অন্যতম আরো একটি লক্ষ্য হল কুরআন মত জীবনপরিচালনা করা। এ ব্যাপারে আদেশ দিয়ে নাযিল হয়েছে..

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106)

রাব্ব থেকে ওহীর মাধ্যমে যা দেওয়া হয়েছে তুমি শুধু তারই অনুকরণ করবে। কারন তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের উপেক্ষা কর। (আনুগত্য ও অনুকরণের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন "ইলাহ ও রাব্ব"। ইলাহের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য বা অনুকরণ বৈধ নয়। আর আল্লাই তোমাদের একমাত্র রাব্ব এবং একমাত্র ইলাহ। তাই আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত অন্যকিছুর অনুকরণ করলে অন্যকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়া হবে যা শিরকেরই নামান্তর) (৬ আনয়া'মঃ ১০৬)

অনুচ্ছেদঃ ১৩. কুরআন বিমুখ জীবন

বাস্তব জীবিনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে কুরআন মত জীবন পরিচালনা করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব আর এর বিপরিতে যাওয়া কুফর। যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে, তারা মুনাফিক হয়ে যাবে, তাদের আমল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125)
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ (126) وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ(127)

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার যিকর (আল-কুরআন -দেখুন হুজরঃ ৯) বিমুখ হয়ে যাবে তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে যাবে, কিয়ামতে তাকে আমি অন্ধ করে তুলব।

১২৫. সে বলবেঃ হে রাব্ব! আমাকে অন্ধ করে কেন উঠালে? (দুনিয়াতে) আমি চক্ষুমান চক্ষুষ্মান /চক্ষুষ্মতী ছিলাম।

১২৬. আল্লাহ বলবেনঃ আমার আয়াত (কিতাব) আসার পর এমনি ভাবে তুমি তা (মেনে চলার ব্যাপারটি) ভুলে থেকে ছিলে, অনুরূপভাবে তোমাকে (চক্ষু দেয়ার ব্যাপারটি) আজ ভুলে থাকা হল।

১২৭. যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে, প্রভুর আয়াত (কিতাব, বিধান) অমান্য করে তার প্রতিফল আমি এভাবে-ই দিয়ে থাকি। আখেরাতের আযাব বড় কঠিন ও চিরস্থায়ী হয়। (২০ ত্বাহাঃ ১২৪-১২৭)

জ্ঞাতব্যঃ যে বা যারা আল্লাহর কিতাব বিমুখ জীবন যাপন করবে এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা করা হবে এবং তাদেরকে আরো নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজের শুধু অমুসলিমরা-ই নয় বরং মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানা ভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যে সব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে-ই কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও রীতিনীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা হল বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগত ভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব। আল-কুরআন শিক্ষা দেয় আল্লাহ-ই সকল ক্ষমতার উৎস আর গণতন্ত্রের শিক্ষা হল জনগণ-ই সকল ক্ষমতার উৎস। ইত্যাদি।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম আদর্শগত ভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সূদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি-ই সূদ। (কুরআন বিমুখ জীবন সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ যুখরুফঃ ৪৪)
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছেন তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত আছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ'র সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাত মুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও।